ডনম ডনম

হুমায়ূন আহমেদ

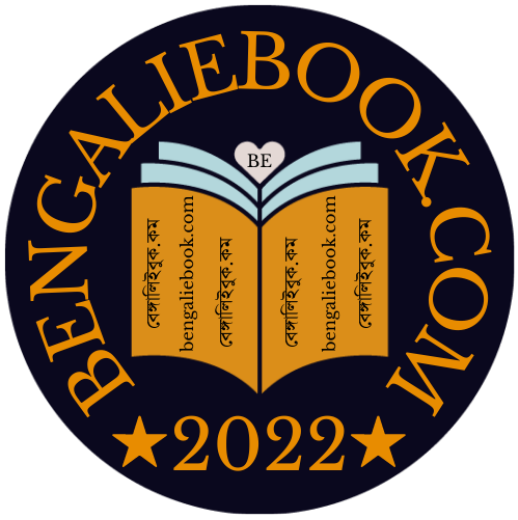

সূচিপত্র

১. তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে.....3

২. হারিকেন জ্বালাতে গিয়ে.....20

৩. সব পুরুষকেই এক রকম মনে হয়.....36

৪. বাড়িটা ইসমাইল সাহেবের.....46

৫. টুকু পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে.....56

৬. টুকুর খোঁজ নেই.....65

৭. পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা.....74

৮. যাদের সঙ্গে তিথির সময় কাটাতে হয়.....77

৯. টুকু বুঝতেই পারল না.....91

১০. পীর সাহেব বলেছিলেন.....97

১১. মনটা খুবই ব্যাড হয়ে আছে.....102

১২. আমার নাম দবির.....110

১৩. ফরিদার চোখ দু'টি.....126

১৪. অরু এসে উপস্থিত.....132

১৬. অজন্তা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল.....150

১৬. টুকু অরুকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে.....160

১৭. তিথি নাসিমুদ্দিনের কাছে এসেছে.....174

১৮. এ্যানা টি স্টল.....186

১৯. অরুর চাকরি হয়ে গেল.....200

২০. তিথি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে.....210

২১. বিশাল আকাশ.....218

১. তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে

তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্যি আঠার-উনিশ বছরের মেয়েরা বিনা কারণেই আয়নার সামনে দাঁড়ায়। তিথির বয়স একুশ। সেই হিসেবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ করা যেতে পারে। এই বয়সের মেয়েরা অন্যের মাঝে নিজের ছায়া দেখতে ভালবাসে। যে কারণে পুকুর দেখলেই পুকুরের পানির উপর ঝুঁকে পড়ে। আয়নার সামনে থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখতে বড় ভাল লাগে।

তিথির বয়স একুশ হলেও এইসব যুক্তি তার বেলায় খাটছে না। কারণ ঘর অন্ধকার। আয়নায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যদিও বাইরে শেষ বেলার আলো এখনো আছে। সেই আলোর খানিকটা এ ঘরে আসা উচিত। কিন্তু আসছে না। বৃষ্টির মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে। এখন বৃষ্টি নেই। দরজা-জানালা অবশ্যি খোলা হয়নি। কারণ আবার বৃষ্টি আসবে। আকাশে মেঘা জমতে শুরু করেছে।

এই ঘরে সে ছাড়াও আরো একজন মানুষ আছে, তার বাবা শিয়ালজানি হাই স্কুলের রিটায়ার্ড অ্যাসিসেটেন্ট হেড মাস্টার জালালুদ্দিন সাহেব। জালালুদ্দিন সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। খানিকক্ষণ আগে তার ঘুম ভেঙেছে। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার চোখে সমস্যা আছে। চোখ প্রায় নষ্ট। কিছুই দেখতে পান না। কড়া রোদে আবছা আবছা কিছু দেখেন। সত্যি দেখেন না কল্পনা করে নেন তা বোঝা মুশকিল। আজ তার কাছে মনে হচ্ছে তিনি তার বড় মেয়েকে এই অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছেন। শ্যামলা

মেয়েটির বালিকাদের মত সরল মুখ, বড় বড় চোখ সব তিনি পপিন্ধাব দেখতে পাচ্ছেন। কী আশ্চর্য্য কাণ্ড।

জালালুদ্দিন সাহেব প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করলেন। তার চোখ কি তাহলে সেরে গেল নাকি? গত সাতদিন ধরে একটা কবিরাজি ওষুধ তিনি চোখে দিচ্ছেন নেত্র সুধা! ওষুধটা মনে হচ্ছে কাজ করেছে। জালালুদ্দিন চিকন গলায় ডাকলেন, ও তিথি।

তিথি বাবার দিকে ফিবে তাকাল। কিছু বলল না।

চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রে মা! তোর পরনে একটা লাল শাড়ি না? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

তিথি বলল, শাড়ির রঙ নীল। বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজ সে বাইরে যাবে। বাইরে যাবার আগে কারো সঙ্গে কথা বলতে তার ভাল লাগে না।

তিথি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বইল আবার বৃষ্টি আসবে কি না বুঝতে চেষ্টা করল। বৃষ্টি আসুক বা না। আসুক তাকে বেরুতেই হবে। সে রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘরে তিথির মা মিনু চুলা ধরানোর চেষ্টা করছেন। কাঠ ভেজা। কিছুতেই আগুন ধরছে না। বোতল থেকে কেরোসিন ঢাললেও লাভ হয় না। ধপ করে জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ পর আগুন নিভে যায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। তিথি একটা মোড়ায় বসে মাকে দেখছে। মিনু বিরক্ত গলায় বললেন তুই বসে বসে ধোঁয়া খাচ্ছিস কেন? বারান্দায় গিয়ে বোস। তিথি নিঃশব্দে উঠে এলো। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ। ঘোর বর্ষা।

তাদের বাসাটা কল্যাণপুর ছাড়িয়েও অনেকটা দূরে। জায়গাটার নাম সুতাখালি। পুরোপুরি গ্রাম বলা যায়। চারদিকে ধানি জমি। তবে ঢাকা শহরে লোকজন বেশির ভাগ জমিই কিনে ফেলেছে। তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে সাইনবোর্ড বুলিয়ে দিয়েছে দিস প্রপার্টি বিলংস টু. দেয়াল ঘেরা অংশে পানি থৈ থৈ করে। পানির বুক চিরে যখন-তখন হলুদ রঙের সাপ সাঁতরে যায়। জায়গাটায় সাপখোপের খুব উপদ্রব। তবে অবস্থা নিশ্চয়ই এ রকম থাকবে না। তিন-চার বছরের মধ্যেই চার-পাঁচতলা দালান উঠে যাবে। ইলেকট্রিসিটি গ্যাস চলে আসবে। সন্ধ্যাবেলা চারদিক ঝলমল করবে। তিন কামরার একটি বাড়ির ভাড়া তিন-চার হাজার টাকা। তিথিদের এই বাড়িটার ভাড়া মাত্র ছ'শ। রান্নাঘর ছাড়াই তিনটা কামরা আছে। এক চিলতে বারান্দা আছে। করোগেটেড টিনের শিটের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রান্নাঘরের পাশে তিনটা পেঁপে গাছ আছে। তিনটা গাছেই প্রচুর পেঁপে হয়। ছ'শ টাকায় এ-ই বা মন্দ কী?

মিনু চায়ের কাপ দিয়ে বারান্দায় এসে বিরক্ত মুখে বলল, আবার বৃষ্টি নামল! এই বৃষ্টির মধ্যে যাবি কিভাবে? তিথি জবাব দিল না। আকাশের মেঘের দিকে তাকাল। মেঘ দেখতে সব মেয়েরই বোধ হয় ভাল লাগে। তিথির চোখে-মুখে এক ধরনের মুগ্ধতা।

মিনু বললেন, চায়ে চুমুক দিয়ে দেখ মিষ্টি লাগবে কি-না।

চা খাব না। মা। বাবাকে দিয়ে দাও।

তোর বাবার জন্যে তো বানিয়েছি, তুই খা।

ইচ্ছা করছে না। শরীর খারাপ নাকি রে?

না। শরীর ভালই আছে। টুকু ঘরে আছে কি-না দেখ তো মা। আমাকে এগিয়ে দেবে। টুকু ঘরে ছিল। বাবার সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। মিনু চাদর সরিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন–হারামজাদা বান্দর। সন্ধ্যাবেলায় ঘুম। টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব।

জালালুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মারধর করা ঠিক না। ব্রেইনে এফেক্ট করে।

মিনু তীব্র গলায় বললেন তুমি চুপ করে থাক। তোমাকে মারধর করা হয়নি। সামনে চায়ের কাপ আছে ফেলে একাকার করবে না।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাবার আগেই হীরুকে দেখা গেল পানিতে ছপছপ শব্দ করতে করতে আসছে। হীরু তিথির এক বছরের বড়। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের জন্য বয়স অনেক বেশি মনে হয়। হীরুর এক হাতে দড়িতে বাধা ইলিশ মাছ। অন্য হাতে টর্চ। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝাপসামত আলো বেরুচ্ছে। হীরু পাঁচদিন আগে আধমণ চাল কিনবার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। আজ ফিরছে। তিথি না দেখার ভান করল।

হীরু গম্ভীর গলায় বলল, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

তিথি জবাব দিল না। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। যেন সে এই মানুষটাকে চেনে না। এ যেন রাস্তার একজন মানুষ। পরিচিত কেউ নয়।

কি রে, কথা বলছিস না কেন?

তোর সঙ্গে কথা বলার কিছু আছে?

আরে কি মুশকিল, এত রেগে আছিস কেন? বৃষ্টি-বাদলা দিনে এত রাগ ভাল না। বাসায় চল। বাসায় গিয়ে কী হবে?

হবে। আবার কী? গরম গরম ভাত আর ইলিশ মাছ ফ্রাই খাবি। চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনলাম। এমনিতে সত্তর টাকা দাম। বৃষ্টি-বাদলা বলে বাজারে লোক নেই। পানির দামে সব ছেড়ে দিচ্ছে।

তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। বাসায় যা। বাসায় গিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা খা।

রাতে ফিরবি তো? ফিরলে কখন ফিরবি বলে যা, বাস স্ট্যান্ডে থাকব। দিনকাল ভাল না।

আমার জন্যে কাউকে দাঁড়াতে হবে না। আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু চড় লাগাব। ফাজিল কোথাকার। চোরের চোর।

আরে কি মুসিবত, মুখ খারাপ করছিস কেন? আমি তোর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি, তুই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবি। আমি কী গালাগালি করছি?

চুপ কর।

ধমক দিচ্ছিস কেন? তোর বড় ভাই হই মনে থাকে না? সংসারকে দু'টা পয়সা দিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস। পয়সা কিভাবে আনছিস সেটা বুঝি আমি জানি না? এই শর্মা মায়ের বুকের দুধ খান না। সব বুঝে। তোর ঐ পয়সায় আমি পেচ্ছাব করে দেই। আই মেক ওয়াটার। বুঝলি ওয়াটার। আমার স্ট্রেইট কথা। পছন্দ হলে হবে। না হলে–নো প্রবলেম।

তিথি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। হীরু লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বারান্দায় উঠেই সে সহজ গলায় বলল মা, মাছটা ধর তো। তার বলার ভঙ্গি থেকে মনে হতে পারে সে কিছুক্ষণ আগে মাছ কেনার জন্যেই গিয়েছিল। কিনে ফিরেছে।

মিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। হীরু মার দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, ঘরে সর্ষে আছে মা? যদি থাকে, সর্ষে বাটা লাগিয়ে দাও। কুমড়ো পাতা খোঁজ করছিলাম। পাইনি। পেলে পাতুরি করা যেত। বর্ষা-বাদলার দিনে পাতুরির মত জিনিস হয় না।

মিনু শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুই বেরিয়ে যা। হীরু অবাক হয়ে বলল, কোথায় বেরিয়ে যাব?

যেখানে ইচ্ছ যা। এই বাড়িতে তোকে দেখতে চাই না।

ঠিক আছে যেতে বলছি যাব।

এক্ষুণি যা।

আচ্ছা ঠিক আছে। মাছটা সখ করে এনেছি, রান্নাবান্না কর খেয়ে তারপর যাই। এক ঘণ্টা আগে গেলেও যা পরে গেলেও তা।

মিনু মাছ উঠোনের কাদার মধ্যে ছুড়ে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। হীরু উঁচু গলায় বলল, আমার ওপর রাগ করছ কর মাছের ওপর রাগ করছে কেন? এই বেচারা তো কোনো দোষ করেনি। একের অপরাধে অন্যের শাস্তি এটা কি রকম বিচার?

মিনু রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন ঘরে ঢুকলে বঁটি দিয়ে তোকে চাকা চাকা করে ফেলব। খবরদার! হীরুর তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরুকে দেখা গেল। গামছা লুঙ্গির মত করে পরে বঁটি দিয়ে অন্ধকারে মাছ কুটতে বসেছে। কথা বলছে নিজের মনে। এমন ভাবে বলছে যেন রান্নাঘর থেকে মিনু শুনতে পান।

সব কিছু না শুনেই রাগ। আরে আগে ঘটনাটা কি ঘটেছে শুনতে হবে না? না শুনেই চিৎকার, চেঁচামেচি। চাল কিনতে বাজারে ঢুকেছি। নাজিরশাল চাল। দেখেশুনে পছন্দ করলাম। বস্তার মধ্যে নিলাম বিশ সের। টাকা দিতে দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি পরিষ্কার। সাফা করে দিয়েছে। চাল না নিয়ে বাসায় ফিরি কিভাবে? চক্ষু লজ্জার ব্যাপার আছে না? গোলাম রশীদের কাছে টাকা ধার করতে। সেইখানে গিয়ে দেখি রশীদ শালা টেম্পোর সঙ্গে একসিডেন্ট করে এই মরে সেই মরে. গোলাম হাসপাতালে, দিলাম ব্লাড। ব্লাড দেয়ার পরে দেখি নিজের অবস্থা কাহিল। ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, সিস্টার এসে ধরল...

মিনু রান্নাঘর থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ নিয়ে বের হলেন। শীতল স্বরে বললেন আর একটা কথা না। হীরু চুপ করে গেল।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, খালি পেটে চা খাওয়াটা ঠিক হবে না। আলসার ফালসার হয়। ঘরে আর কিছু আছে?

মুড়ি আছে। মুড়ি মেখে দেব?

থাকলে দাও। খিদে খিদে লাগছে।

ঐ একটা জিনিসই তো তোমার লাগে ক্ষিধা। সকালে ক্ষিধা, বিকালে ক্ষিধা, সন্ধ্যায় ক্ষিধা।

মিনু আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন। চাপা স্বরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, এর নাম সংসার। স্বামীপুত্র-কন্যার সুখের সংসার। এত সুখ আমার কপালে। আমি হলাম গিয়ে সুখের রানী চম্পাবতী।

জালালুদিনের চোখ এখন বন্ধ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ করকার করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি হাতড়ে হাতড়ে চায়ের কাপ নিলেন। চুমুক দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। নরম স্বরে ডাকলেন ও টুকু। টুকুন রে।

টুকু জবাব দিল না। বিনা কারণে মার খেয়ে তার মন খুব খারাপ হয়েছে। সে বসে আছে গম্ভীর মুখে। জালালুদ্দিন আবার ডাকলেন, ও টুকু। ও টুকুন।

কী?

চোখটা মনে হচ্ছে সেরেই গেছে। খানিক্ষণ আগে তিথিকে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম। শাড়ির রঙটা অবশ্য ধরতে পারিনি।

টুকু কিছুই বলল না।

তিনি তাতে খুব একটা ব্যথিত হলেন না। এ বাড়িতে বেশির ভাগ লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। তার এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

ও টুকু?

কী?

মাগরেবের আজান হয়েছে?

জানি না।

চা খাবি? পিরিচে ঢেলে দেই? জ্বরের মধ্যে চা ভাল লাগবে। ওষুধের মত কাজ করবে। পাতার রসটা ডাইরেক্ট আসছে। কুইনিন কী জিনিস? গাছের বাকলের রস। গাছের রস। খুবই উপকারী।

টুকু কোনো কথা না বলে খাট থেকে নেমে গেল। তার বয়স তের। কিন্তু দেখে মনে হয়। ন'দশ। শরীর খুবই দুর্বল। কিছু দিন পরপরই অসুখে পড়ছে। আজ জ্বরের জন্যে সে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বারান্দায় বালতিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা। টুকু মগ ডুবিয়ে পানি তুলছে। বরফ শীতল সেই পানিতে মুখ ধুতে গিয়ে শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিশ্চয়ই এখনো গায়ে জ্বর আছে। নয় তো পানি এত ঠাণ্ডা লগত না। মুখে পানি ঢালতে ঢালতে সে তিথির দিকে তাকাল। আপাকে কি সুন্দর লাগছে! আপা আর একটু ফর্সা হলে কি অদ্ভুত হত!

তিথি বলল, টুকু আমাকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?

টুকু মাথা নাড়ল। ভেতর থেকে জালালুদ্দিন ডাকলেন তিথি, শুনে যা তো মা।

তিথি বারান্দা থেকে নড়ল না। সেখান থেকেই বলল কি বলবে বল।

এই সন্ধ্যাবেলা কোথায় বেরুচ্ছিস? কি রকম ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে দেখছিস না।

আমার কাজ আছে।

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কিসের কাজ? বাদ দে।

সে জবাব দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, খবরদার বেরুবি না। কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক। মানুষ কী পিঁপড়া নাকি যে রাতদিন কাজ করবে।

মিনু ঝাঁঝাল গলায় বললেন, চুপ কর। সব সময় কথা বলবে না।

এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে নাকি?

তোমাকে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

বৃষ্টিতে ভিজে একটা জ্বরজ্বারি বাঁধাবে...সিজন চেঞ্জ হচ্ছে।

বললাম তো তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তিথি যখন বেরুল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। চারদিক অন্ধকার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সে ঘর থেকে বেরুবার সময় কাউকে কিছু বলে বেরুল না। মিনু বারান্দাতেই ছিলেন তার দিকে তাকিয়ে একবার বললও না মা, যাচ্ছি। যেন সে তাকে দেখতেই পায়নি।

ঘরে ছাতা নেই। তিথি মোটা একটা তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে রাস্তায় নেমেছে। খালি পা। স্যান্ডেল জোড়া হাতে। কাঁচা রাস্তা, খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। টুকু আগে আগে যাচ্ছে। তার মাথায় কিছু নেই। বৃষ্টিতে মাথার চুল এর মধ্যেই ভিজে জবজবে। তিথি বলল, বাসায় গিয়ে ভাল করে মাথা মুছে ফেলবি। নয় তো জ্বরে পড়বি।

টুকু মাথা কাত করল। মৃদু গলায় বলল, রাতে ফিরবে না। আপা?

না।

সকালে আসবে?

হুঁ। এবার বর্ষা আগেভাগে এসে গেল তাই না রে টুকু। মনে হচ্ছে শ্রাবণ মাস। তাই না?

হুঁ।

গতবারের মত এবারও ঘরে পানি উঠবে কি-না কে জানে। তোর কি মনে হয় উঠবে?

টুকু জবাব দিল না। তার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

কলাবাগানের ভেতরের দিকে একটা বাড়ির সামনে তিথি এসে উপস্থিত হয়েছে। তার শাড়ি কাদা-পানিতে মাখামাখি। হোচট খেয়ে স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। নখের খানিকটা ভেঙে যাওয়ায় রক্ত পড়ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর মাঝবয়েসী এক লোক দরজা খুলল। তার খালি গা। হাঁটু পর্যন্ত উঁচুতে লুঙ্গি উঠে আছে। পরার ধরন এমন যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়ে যাবে। তার কোলে তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা। ভদ্রলোক বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছেন। বাচ্চা ঘুমুচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঝিম করে থাকে আবার মাথা তুলে হিক জাতীয় বিচিত্র শব্দ করে।

তিথি বলল, নাসিম ভাই কেমন আছেন? নাসিম বিরক্ত গলায় বলল, এই তোমার বিকাল পাঁচটা, কটা বাজে তুমি জানো?

তিথি চুপ করে রইল।

নাসিম বলল, আটটা পঁচিশ।

তিথি হালকা গলায় বলল, দূরে থাকি। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তাই দেরি হল।

দূরে তুমি একা থাক নাকি? অন্যরা থাকে না? কতবার বললাম খুব ভাল পার্টি হাজার খানিক টাকা পেয়ে যাবে। বেশিও দিতে পারে। নতুন পয়সা-হওয়া পার্টি। এদের টাকার মা-বাপ আছে? উপকার করতে চাইলে এই অবস্থা।

ভেতরে আসতে দিন নাসিম ভাই। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।

আস আস, ভেতরে আস। পা কেটেছে নাকি?

হুঁ।

ইস, রক্ত বের হচ্ছে দেখি। যাও, বাথরুমে ঢুকে শাড়ি বদলে ফেল। তোমার ভাবীকে বল শাড়ি দিবে। আজ রাতে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না। ভাল একটা পার্টি চলে গেল।

আজ তাহলে চলে যাব?

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যাবে কোথায়? কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে মুশকিলে পড়বে।

নাসিম ভাই এখানে কোনো জায়গা থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে?

কোথায় টেলিফোন করবে?

তিথি চুপ করে রইল। নাসিম বলল, শোন তিথি একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন পার্টির সাথে বাড়তি খাতির রাখবে না। যত দূরে থাকা যায়। ফেল কড়ি মাখ তেল। এর বেশি কিছু নয়।

সে রকম কিছু না নাসিম ভাই।

সে রকম কিছু না হলেই ভাল।

নাসিম গলা উঁচিয়ে বলল বীনা, কই চা দাও দেখি। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলিন আছে? বাথরুমের তাকে দেখ তো। আর এক বান্দরের বাচ্চা তো ঘুমাচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আছাড় দিয়ে পেটটা গালিয়ে দেই। চুপ, কানবি না। একদম চুপ।

রীনা এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। একবার শুধু সরু চোখে দেখল তিথিকে। আগেও অনেকবার দেখেছে কখনো কথা হয়নি। আজও হল না। রীনার বয়স ষোল-সতের। এর মধ্যে দু'টি বাচ্চার মা হয়েছে। তৃতীয় বাচ্চা আসার সময়ও প্রায় হয়ে এল। রোগা শরীরের কারণে তার সন্তানধারণজনিত শারীবিক অস্বাভাবিকতা খুবই প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।

নাসিম বলল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ভেতরে গিয়ে শাড়ি বদলে আস। পায়ে কিছু দাও।

শাড়ি বদলাব না চলে যাব।

এত রাতে?

রাত বেশি হয়নি। বাস আছে।

রাতিবিরাতে এরকম চলাফেরা ভাল না, কখন কোন বিপদ হয়।

রীনা চা নিয়ে এসেছে। এত দ্রুত সে চা বানাল কি করে কে জানে। মেয়েটা খুবমই কাজের। তিথির চা খেতে ইচ্ছা করছে না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। জ্বর আসবে কি-না কে জানে। নাসিম পিরিচে ঢেলে বড় বড় চুমুকে চা খাচ্ছে। প্রতিবার চুমুক দিয়ে আহ করে একটা শব্দ করছে। সামান্য চায়ে এত তৃপ্তি। কিছু কিছু মানুষ খুব অল্পতে সুখী হয়।

তিথি।

জি।

থাকতে চাইলে থাক, অসুবিধা কিছু নেই। খালি ঘর আছে।

না থাকব না।

পরশু, তরশু একবার এসো। দেখি যদি এর মধ্যে ভাল কোনো পার্টি পাই। ফরেনার পাওয়া গেলে ভাল। এদের দরাজ দিল। খুশি হলে হুঁশ থাকে না। তবে সব না। কিছু আছে বিরাট খচ্চর। চামড়া সাদা হলেই যে দরাজ দিল হয় এটা ঠিক না। সাদা চামড়ার মধ্যেই খচ্চর বেশি।

নাসিম নিজের ছাতা হাতে তিথিকে বাসে তুলে দিতে গেল। যাবে জানা কথা। যে অল্প কিছু ভাল মানুষের সংস্পর্শে তিথি এসেছে নাসিম তার মধ্য একজন। সে বাসে তিথিকে

শুধু সে উঠিয়েই দিয়ে আসবে তাই না বাসের ড্রাইভারকে বলে আসবে একটু খেয়াল রাখবেন ভাইসব, একা যাচ্ছে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পানি উঠে গেছে। পানি ভেঙে যেতে হচ্ছে। নাসিম বলল, এক ফোঁটা বৃষ্টি হলে দুই হাত পানি হয়ে যায়। এই রহস্যটা কি বুঝলাম না। তিথি কিছু বলল না। নাসিম বলল, তোমার ভাই চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছে?

না।

মটর মেকানিকের কাজ শিখবে নাকি জিজ্ঞেস করো তো। লাগিয়ে দেব। ভালমত কাজ শিখতে পারলে কাঁচা পয়সা আছে, জিজ্ঞেস করো।

আচ্ছা জিজ্ঞেস করব।

টেলিফোন করতে চেয়েছিলে–কার কাছে টেলিফোন?

চেনা একজন।

পাওয়ারফুল কেউ হলে যোগাযোগ রাখবে কখন দরকার হয় কিছু বলা যায় না।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছানো মাত্র বাস পাওয়া গেল। ফাঁকা বাস। পেছনের দিকে তিন-চারজন মানুষ বসে আছে। নাসিম বাসের ড্রাইভারকে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান একটু দেখেশুনে নামাবেন, মেয়েছেলে একা যাচ্ছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা এগিয়ে দিল। নাসিম সিগারেট খায় না, অন্যকে দেবার জন্যে সব সময় সঙ্গে রাখে।

তিথির হাতে সে একশ টাকার নোটি গুঁজে দিল। এটা হচ্ছে ধার। হাতে টাকা এলে শোধ দিতে হবে।

বাস না ছাড়া পর্যন্ত নাসিম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল। তিথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। এই মানুষটা তার চমৎকার একজন বড় ভাই হতে পারত। কেন হল না?

২. হারিকেন জ্বালাতে গিয়ে

হারিকেন জ্বালাতে গিয়ে মিনু দেখলেন তেল নেই। অথচ কাল হারিকেনে তেল ভরার পরও বোতলে চার আঙুলের মত অবশিষ্ট ছিল। গেল কোথায়? টুকু ফেলে দিয়েছে? সকালবেলা কেরোসিনের বোতল নিয়ে কি যেন করছিল; মিনুর বিরক্তির সীমা রইল না। টুকু বাড়ি নেই। সকালে টুকুকে তিনি কিছু শাস্তি দিয়েছেন। দুবার চুল ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিযেছেন। সে নিঃশব্দে কেঁদেছে কিন্তু কিছু বলেনি। তিনি একাই চেঁচিয়েছেন কঠিন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। টুকু শুধু শুনে গেছে, মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন যাতে মনে হয় পৃথিবীর হৃদয়হীনতায় সে খুব অবাক হচ্ছে। এতে মিনুর রাগ আরও বেড়েছে। সেই রাতের চরমতম প্রকাশ তিনি দেখালেন। দুপুরে ভাত খাবার সময়। টুকুর সামনে থেকে ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, যা তোরা ভাত নেই।

টুকু মায়ের দিকে কয়েকবার ভয়ে ভয়ে তাকাল। উঠে গেল না। বসেই রইল। সে ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। মিনু কঠিন গলায় বললেন উঠ, নয় তো পিঠে চ্যালাকাঠি ভাঙব। টুকু তবু বসে রইল। তিনি সত্যি সত্যি হাতে চ্যালাকাঠ নিলেন। টুকু উঠে বারান্দার জলচৌকিতে বসে রইল। তার মনে ক্ষীণ আশা কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার ডাক আসবে। বিশেষ করে আপা আজ বাসায় আছে। সে নিশ্চয়ই তাকে ফেলে খাবে না। টুকু অবাক হয়ে দেখল। আপা তাকে রেখেই ভাত খেল। খাওয়ার শেষে বারান্দায় হাত ধুতে এসে বলল, টুকু আমাকে মোড়ের দোকান থেকে একটা পান এনে দে। বমি বমি লাগছে।

টুকু পান এনে দিয়ে আবার এসে বসল। বারান্দায়। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, মা রান্নাঘরের ঝামেলা শেষ করে দরজায় শিকল তুলে দিচ্ছেন। এই বাড়ির একজন যে না

খেয়ে আছে, এই কথা তিনি বোধ হয় সত্যি ভুলে গেছেন। টুকু তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে উঁকি দিল–মা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুকু ভীতু ধরনের ছেলে। সাধারণত সন্ধ্যার আগেই ফিরে। আজ এখনো ফিরছে না। দিন খারাপ করেছে। আজও হয়ত ঝড়বৃষ্টি হবে। ক'দিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হচ্ছে। মিনু তেলশূন্য হারিকেন নিয়ে তিথির ঘরে এলেন।

তিথি চাদর গায়ে বিছনায় বসে আছে। তার গায়ে জ্বর। ঐদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর থেকেই সে জ্বরে পড়েছে। এখন জ্বর খানিকটা বেড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে যে বাতাস আসছে তা তেমন ঠাণ্ডা নয়। তবু তিথির গা শিরশির করছে। উঠে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে না।

মিনু ঘরে ঢুকেই বলল–চার আঙুল তেল ছিল বোতলে। কোথায় গেল জানিস? তিথি বলল, জানি না।

বাতাসে তো উড়ে যায়নি।

বিড়াল ফেলে দিয়েছে হয়ত।

এখন কাকে দিয়ে তেল আনাই?

টুকু আসেনি এখনো?

না।

ও এলে এনে দিবে। তুমি জানালা বন্ধ করে দাও তো মা, ঠাণ্ডা লাগছে।

এই গরমে ঠাণ্ডা লাগছে? জ্বর নাকি? দেখি।

মিনু, তিথির কপালে ছুঁয়ে দেখতে গেলেন। তিথি একটু সরে গিয়ে বলল, গায়ে হাত দিও না মা। মিনু বিস্মিত হয়ে বললেন–গায়ে হাত দিলে কি?

কিছু না। আমার ভাল লাগে না।

মা গায়ে হাত দিলে ভাল লাগে না, এটা কি ধরনের কথা? বলছিস কি এসব?

তোমার সঙ্গে বকবক করতেও ইচ্ছা করছে না। জানালাটা বন্ধ করে চলে যাও।

মিনু জানালা বন্ধ করে চলে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝমোঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। রান্নাঘরে চুলায় আগুন জ্বলছে। বাড়িতে এইটুকুই আলো।

মিনু রান্না চড়িয়েছেন। আয়োজন তেমন কিছু না। গতকালের ঝড়ে একটা পেঁপে গাছ পড়ে গেছে। সেই পেঁপের একটা তরকারি। আর ডাল। চাল ক'জনের জন্যে নেয়া হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিথির জ্বর এসেছে, সে নিশ্চয়ই রাতে কিছু খাবে না। হীরু আসবে কি আসবে না কে জানে। গত তিন দিন ধরে রাতে খাওয়ার সময় আসছে। আজও হয়ত আসবে। টুকু এখনো ফেরেনি। তবে সে অবশ্যই ফিরবে তার যাবার জায়গা নেই। এক'দিন যখন হীরুর মত কোথাও জায়গা হবে তখন সেও আসা বন্ধ করবে।

জালালুদ্দিন রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজ তার চোখের যন্ত্রণাটা একটু কম। আগের কবিরাজি ওষুধ বাদ দিয়ে পদ্মমধু দিচ্ছেন–এতে সম্ভবত কাজ হচ্ছে। তবে চোখ আটা আটা হয়ে থাকে–এই যা কষ্ট।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন–এক ফোঁটা চা হবে? মিনু ঠাণ্ডা গলায় বললেন–না।

চুলা বন্ধ?

হুঁ।

বৃষ্টি-বাদলায় গলাটা খুসখুসি করে। কর একটু চা। আদা-চা।

জালালুদ্দিন খানিকটা দূরত্ব রেখে স্ত্রীর কাছে বসলেন। আজ তার চোখের যন্ত্রণা কম থাকায় মনটা বেশ ভাল। মিনুর সঙ্গে গল্পসল্প করতে ইচ্ছা করছে। প্রথম যৌবনে তাদের যখন নতুন সংসার হল–সোহাগী স্টেশনের কাছে বাসা নিয়েছিলেন। রান্নাঘর অনেক দূরে। মিনু একা রান্না করতে ভয় পেত। তখন কতই বা তার বয়স? তের কিংবা চৌদ্দ। নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। তাকে রাতের বেলা রান্নার সময় সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে বসে থাকতে হত। রান্না হবার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একবার শোবার ঘরে আসা। কত মধুর স্মৃতি। কত বর্ষার রাত রান্নাঘরে পাশাপাশি বসে কেটেছে। অর্থহীন কত গল্প হাসি তামাশা। মান-অভিমান। আজকের এই কঠিন মিনু সেদিন কোথায় ছিল?

জালালুদ্দিন ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন–চোখের যন্ত্রণা একেবারেই নেই। এই যে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছি চোখ কিন্তু কড়াকড়ি করছে না।

না করলে তো ভালই।

দেখি একটু আগুন। সিগারেট খাই একটা। হীরু একটা প্যাকেট দিয়ে গেল।

মিনু দেয়াশলাই এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন সিগারেট ধরিয়ে হৃষ্টচিত্তে টানতে লাগলেন। নরম গলায় বললেন, পদ্মমধু আসলে খুব ভাল মেডিসিন। তবে খাঁটি জিনিস হতে হবে। দুনিয়া ভর্তি ভেজাল। পাবে কোথায় খাঁটি জিনিস?

মিনু জবাব দিলেন না। ডাল চড়িয়েছিলেন, ডালের হাঁড়ি নামিয়ে এলুমিনিয়ামের একটা মাগ চুলায় বসিয়ে দিলেন। চা হচ্ছে। জালালুদিনের চোখ চকচক করছে। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন–চোখ সত্যি সেরে গেলে প্রাইভেট টিউশ্যানি ধরব। দুতিনটা ছেলেকে পড়ালেই হাজার বারশ টাকা চলে আসবে। ঢাকা শহরে প্রাইভেট টিউটরের খুবই অভাব। নাই বললেই হয়। তুমি কি বল?

মিনু কিছু বললেন না, বিচিত্র একটা ভঙ্গি করলেন। জালালুদ্দিন চোখের অসুখের কারণে সেই ভঙ্গি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে তাঁর খুব মন খারাপ হত। তিনি বললেন, সংসারটা তখন ঠিকঠাক করা যাবে। তারপর হীরু একটা দোকান নেয়ার কথা বলছে, যদি সত্যি সত্যি দেয় টাকা আসবে পানির মত।

দোকান দিচ্ছে?

বলল তো। কালই বলল।

দোকানের টাকা পাচ্ছে কোথায়? বন্ধু-বান্ধব আছে। ঢাকা শহরে বুঝলে মিনু টাকা কোন সমস্যা না, তবে কায়দা-কানুন জানা থাকা চাই। ঢাকা শহরের বাতাসে পয়সা উড়ে। কেউ ধরতে পারে কেউ পারে না।

মিনু চায়ের কাপ স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন চায়ে চুমুক না দিয়েই বললেন, চমৎকার! তুমিও এক কাপ খাও। বৃষ্টি-বাদলার দিন ভাল লাগবে।

মিনু বিরক্ত গলায় বললেন–তোমার খাওয়া তুমি খাও। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তিনি তিথির জন্যে লেবুর শরবত নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ঘর নিকষ অন্ধকার। এই অন্ধকারে তিথি এখনো ঠিক আগের মতই বসে আছে।

লেবুর শরবত এনেছি–নে।

তিথি বলল, কিছু খাব না, খেতে ইচ্ছে করছে না। টুকু এসেছে?

না।

বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে বোধ হয়। আবার একটা বড় অসুখ বাঁধাবে।

মিনু তীব্র গলায় বললেন, আজ আসুক আমি হারামজাদার বিষ ঝাড়ব। তিথি শীতল গলায় বলল, বিষ ঝেড়ে ঝেড়ে তো হীরুর এই অবস্থা করেছ। আর না হয় নাই ঝাড়লে।

মিনু তিথিকে একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

উঠোনে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। মিনু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, টুকু এসেছে বোধ হয়। টুকু না হীরু এসেছে। সে তার মায়ের মুখের উপর টর্চ ফেলে বলল, চারদিক এমন ডার্ক করে রেখেছ ব্যাপার কি?

তিনি জবাব দিলেন না। হীরু মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বাতি টাতি জ্বালাও। কারো কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছি না। সব ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? রাত তো বেশি হয়নি। আপা বাসায় আছে?

সে এই কথারও জবাব পেল না। এ বাড়িতে তার অবস্থাও তার বাবার মত। বেশির ভাগ কথারই কেউ কোনো জবাব দেয় না। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

হীরু অন্ধকারেই গোসল সেরে ফেলল। কেরোসিনের অভাবে বাতি জ্বলছে না জেনেও তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে অতি উৎসাহে তিথিকে বলতে শুরু করল কি করে সে আজ ব্রান্ড নিউ একটা ছাতা জোগাড় করে ফেলেছে।

বুঝলি তিথি, বাস থেকে নামার সময় হঠাৎ দেখি আমার পায়ের কাছে একটা ছাতা। আমার পাশে এক গর্দভ নাম্বার ওয়ান বসে ছিল। ছাতা না নিয়েই ঐ শালা বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েছে।

তুই ঐ ছাতা নিয়ে চলে এলি?

হ্যাঁ। আমি না নিলে অন্য কেউ নিত। কি, নিত না? ব্রান্ড নিউ জিনিস। লেবেলটা পর্যন্ত আছে।

আমার সামনে থেকে যা, বকবক কারিস না। মাথা ধরেছে।

যার কাছেই যাই সেই বলে সামনে থেকে যা। আমি যাবটা কোথায়? এক'দিন বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাব তখন বুঝবি।

চলে যা। তোকে ধরে রাখছে কে?

যাবই তো। কয়েকটা দিন। জাস্ট ফিউ ডেজ। এক'দিন হঠাৎ দেখরি ফুচুং। পাখি নেই। নো বার্ড।

হীরু সিগারেট ধরাল। সিগারেটের আলোয় দেখা গেল সে দাড়ি কেটে ফেলেছে। তবে গোঁফ এখনো আছে। তিথি বলল, তুই মটর মেকানিকের কাজ শিখবি?

হীরু অবাক হয়ে বলল, আমি মোটর মেকানিকের কাজ শিখব? ইয়ার্কি করছিস? চোর-ছ্যাচাড়ের কাজ শিখব, আমি? অন্য কেউ এ কথা বললে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতাম। নেহায়েত তুই বলে এক্সকিউজ করে দিলাম।

হীরু কেরোসিন নিয়ে এসেছে। আশপাশে খানিকটা খুঁজেও এসেছে। টুকুও নেই। এই নিয়ে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা গেল না। ভাত খাবার সময় অত্যন্ত সহজভাবে বলল, দুই-এক রাত বাইরে না কাটালে ছেলেপুলে শক্ত হয় না। থাকুক বাইরে। হার্ড লাইফ সম্পর্কে ধারণা হোক। মেয়ে হলে ভয়ের কথা ছিল। মেয়ে তো না।

মিনু একটি কথাও বললেন না। যথানিয়মে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বাসন-কোসন ধুয়ে রান্নাঘরে শিকল উঠিয়ে দিলেন। রান্নাঘরের কাজ রাতের মত শেষ হল। আবার ভোরবেলায় খোলা হবে। গভীর রাতে বন্ধ হবে। এই ছোট্ট ঘরটার পেছনে জীবন কেটে যাবে।

তিথির জ্বর বেশ বেড়েছে। রাতে সে কিছুই খায়নি। মিনু দু'টি আটার রুটি বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বিরক্ত হয়ে বলেছে রুটি বানাতে তোমাকে বলেছে কে?

না খেয়ে থাকবি?

হাঁ, না খেয়ে থাকব। তুমি যাও ঘুমাও।

আমার সঙ্গে এরকম করে কথা বলছিস কেন?

ভাল করে কথা বলা ভুলে গেছি। এখন আমি শুধু বাইরের মানুষের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারি। খুব মিষ্টি করে বলি।

মিনু ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। উঠোনের পানি বেড়ে বারান্দা ছুয়েছে। এবারো কি আগের বছরের মত ঘরে পানি উঠবে? এবারো হয়ত ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু যাবেনইবা কোথায়?

মিনু সারারাত বারান্দায় বসে কাটালেন। টুকুর জন্যে অপেক্ষা? হয়ত বা তাই। তবে টুকু বাড়ি না-ফেরায় তাকে খুব কাতর মনে হল না। তিনি ছেলে প্রসঙ্গে তেমন কোনো দুশ্চিন্তাও করলেন না। শুধু বসেই রইলেন। শেষ রাতে মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল। সুন্দর জ্যোৎস্না। একা একা জ্যোৎস্না দেখতে তার ভালই লাগল।

অথচ হীরু যখন প্রথম কাউকে কিছু না বলে বাইরে রাত কাটাল কি অসম্ভব দুশ্চিন্তাই না। তিনি করেছিলেন। ঘরের একটি মানুষও ঘুমায়নি। এখন সময় পাল্টে গেছে। টুকুর বাড়ি না-ফেরায় কারো কিছু যাচ্ছে আসছে না। নিতান্তই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। যেন সবাই ধরে নিয়েছে এরকম হবেই। আগামীকাল ভোরে যথাসময়ে সবার ঘুম ভাঙবে। দিনের কাজকর্ম শুরু হবে। আবার রাত আসবে। এর মধ্যে টুকু ফিরে এলেই ভালই, ফিরে না এলেও কিছু আসে যায় না। কে জানে হয়তবা ভালই হয়। তখন হাঁড়িতে চাল কিছু কম দিলেও চলবে।

যখন আকাশ ফরসা হল ঠিক তখন মিনু বারান্দা ছেড়ে উঠলেন। অনেক দিন পর ফজরের নামাজ পড়লেন। এ বাড়ি থেকে ধর্মকর্মও উঠে গেছে। ধর্ম সুখী মানুষের জন্যে, যাদের ইহজগতের কামনার পরও পরবর্তী জগতের জন্যে কামনা থাকে। তার এখন কোনো কামনা-বাসনা নেই। শুধু বেঁচে থাকা। তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। চুলা ধরাতে খুব বেগ পেতে হল। শুকনো কাঠ নেই। এবারের বর্ষা তাকে খুব কষ্ট দেবে।

তিথির ঘুম ভেঙেছে। মুখ না ধুয়েই সে এসেছে রান্নাঘরে। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, টুকু বাড়ি ফিরেনি?

মিনু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, না। তোর জ্বর কমেছে?

তিথি বলল, তুমি এত সহজভঙ্গিতে কথা বলছি কি করে? তোমার চিন্তা লাগছে না?

আমার এত চিন্তা-টিন্তা নেই।

তাই তো দেখছি।

তোর কাছে শখানিক টাকা হবে? চাল কিনতে হবে।

ঐ দিন না কিনলে?

কিনেছি শেষ হয়েছে। আমি একা খেয়ে শেষ করিনি। বুড়ো বয়সে কি আর শুধু শুধু চাল চিবিয়ে খাওয়া যায়?

এসব কেমন ধরনের কথা, মা?

মুখ ধুয়ে আয়। চা খা। আজ কোনো নাশতা নেই। শুধু চা।

জালালুদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আজ শুধু চা তখন একটা হৈচৈ বাধাবার চেষ্টা করলেন। মিনু বরফশীতল গলায় বলল–কোনো রকম ঝামেলা করবে না। একবেলা নাশতা না খেলে কিছু হয় না।

জালালুদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন–সকালের নাশতা হচ্ছে সারারাতের উপবাসের পর প্রথম খাওয়া। দুপুরে না খেলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সকালে...

চুপ।

তিনি চুপ করে গেলেন। টুকু ফিরেছে কি ফিরেনি এই ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুপুরের আগে কিছু খেতে পারবেন না–এই চিন্তাটাই তাকে অস্থির করে ফেলল।

তিথি একশ টাকা দিয়েছে। এই টাকায় দুপুরের বাজার হবে।

চাল কিনতে মিনু নিজেই গেলেন। হীরুকে টাকা দিয়ে পাঠানোর কোনো মানে হয় না। ঘণ্টাখানেক পর এসে শুকনো মুখে বলবে–গ্রেট ট্র্যাজেডি। পকেট সাফা করে দিয়েছে। অল গন। দেশটা হয়ে গেছে চোরের। সবাই থিফ। গ্রেট থিফ। কিংবা দশ কেজি চাল এনে বলবে পনের কেজি। এই সংবারে বাজার অনেক দিন থেকেই মিনু করেন। এই বয়সেও পনের কেজি চালের ভারী বস্তা টেনে এনে বাকি সময়টা শরীরের ব্যথায় নড়তে পারেন না। রান্নাঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। দিনের বেলায় তিনি কখনো শোবার ঘরে ঘুমুতে যান না। দিনের বেলায় রান্নাঘরেই তার শোবার ঘর।

হীরু মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। মিনু একবার বললেন, তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিস কেন?

এমনি আসছি।

না, তুই আসবি না।

আরে কি মুশকিল, এটা পারলিকের রাস্তা। যার খুশি যাবে। যার খুশি যাবে না। তুমি বলার কে?

বলছি তো তুই আমার সঙ্গে আসবি না।

আরে এ তো বড় যন্ত্রণা দেখি, বাজারে গিয়ে টুকুর খোঁজখবর করব না? সারা রাত ধরে একটা ছেলে মিসিং। চিন্তা হয় না?

আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই যা। তুই যাবার পর আমি যাব। সঙ্গে সঙ্গে যাব না।

আমি সঙ্গে গেলে কি তোমার মান যাবে নাকি? কি মুশকিল–এরকম করে তাকাচ্ছ কেন? আচ্ছা বাবা চলে যাচ্ছি। নো হার্ড ফিলিংস।

হীরু চলে যাবার পরও তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঁচা রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে। বাজারে রওনা হয়েছেন। খালি পায়ে। থকথকে নোংরা কাদায় পা ফেলে যেতে হচ্ছে। এককালে তার শুচিবায়ুর মত ছিল। নোংরা দেখলেই গা ঘিনঘিন করত। যে শাড়ি পরে

রাতে ঘুমুতেন ভোরবেলা উঠেই সেটা খুলে ফেলতেন। কোথায় গেছে শুচিবায়ু। এখন নোংরা আবর্জনা পাশে নিয়েও হয়ত ঘুমুতে পারবেন।

তিথি বেরুচ্ছিল। জালালুদ্দিন বললেন, তুই বাইরে যাচ্ছিস? অর্থহীন কথা। জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু তিথি বলল, হুঁ।

আমার চোখটা বেশ ভালই লাগছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছি। পদ্মমধু জিনিসটা অসাধারণ।

তিথি কিছু বলল না। জালালুদ্দিন বললেন–একটু দেখ তো মা–হীরু মনে হয় সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। প্যাকেটটা দিয়ে যা। সিগারেট জিনিসটা খারাপ হলেও মাঝে মাঝে মেডিসিনের মত কাজ করে। সব খারাপ জিনিসের একটা ভাল দিক আছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে না–এভরি ক্লাউড হ্যাঁজ এ সিলভার লাইনিং।

হীরু সত্যি সত্যি প্যাকেট ফেলে গেছে। বেশ দামি সিগারেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস। চারটা সিগারেট আছে। জালালুদ্দিন একটা ধরলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিথি শীতল গলায় বলল, টুকু যে বাড়ি ফিরেনি তুমি জানো?

জানব না কেন, জানি।

চিন্তা লাগছে না তোমার?

চিন্তা তো লাগছেই। চিন্তা লাগবে না কেন? খুবই চিন্তা লাগছে।

দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সুখেই আছ।

চিন্তা করে হবেটা কি? হীরুর বেলায় তো কম চিন্তা করিনি। তাতে লাভটা কি হয়েছে?

তা ঠিক। কোনো লাভ হয়নি।

মাঝে মাঝে তোর বেলায়ও তো এরকম হয়। রাতে বাড়ি ফিরিস না। তোর বেলাতেই যদি...।

জালালুদ্দিন কথা শেষ করলেন না। তার সিগারেট নিভে গিয়েছিল। তিনি সিগারেট ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিথি বলল, আমি যাচ্ছি। বাবা। ভয় নেই। রাতে ফিরে আসব। তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তিনি তার জবাব দিলেন না। সিগারেটটা ধরছে না। এত দামি সিগারেট অথচ বর্ষায় কেমন ড্যাম্প মেরে গেছে। চুলার পাশে রেখে দিলে হত। সিগারেটের সঙ্গে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। তিথিকে বললে লাভ হবে না। সে এখন আর রান্নাঘরে ঢুকবে না। মিনু কখন ফিরবে কে জানে। বাজারে গেলে ফিরতে দেরি করে।

তিথি এখনো যায়নি। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জালালুদ্দিন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবু তার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে খুব সুন্দর লাগছে। চেহারা কেমন মায়া মায়া। তবে স্বভাব কঠিন হয়েছে। বয়সকালে এই মেয়ে তার মায়ের চেয়েও কঠিন হবে। তিথি বলল,

বাবা।

কি?

তোমাকে একটা কথার কথা জিজ্ঞেস করি–ধর, আমি যদি কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং আর ফিরে না আসি তা হলে কি হবে?

জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন কোথায় যাবি তুই? এসব কি ধরনের কথা?

তিথি জবাব না দিয়ে উঠোনে নামলো। উঠোনে অনেক পানি। স্যান্ডেল জোড়া হাতে নিতে হয়েছে। অসম্ভব কাদা। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত খালি পায়ে যেতে হবে। কি বিশ্রী অবস্থা।

৩. সব পুরুষকেই এক রকম মনে হয়

তিথি কখনো তার সঙ্গের পুরুষের দিকে ভাল করে তাকায় না। সব পুরুষকেই তার কাছে এক রকম মনে হয়। একদল কদাকার হাঁসের ছানার মত। সব একই রকম। কাউকে আলাদা করা যায় না। তবে তিথি তার আজকের সঙ্গীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যদিও খুঁটিয়ে দেখার মত কিছু এই লোকটির নেই।

এর বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। কিছু বেশিও হতে পারে। গোঁফ অর্ধেকের বেশি পাকা–অবশ্যি মাথার চুল পাকেনি। হয়ত মাথায় কলপ দিয়েছে। গোঁফে দেয়নি। কিংবা দিয়েছিল–বারবার ধোবার কারণে উঠে গেছে। লম্বাটে মুখ। খুব খাড়া নাক। চোখে বেমানান এক চশমা। চশমা সাধারণত চোখের সঙ্গে লেগে থাকে–নাকের কারণে এর চোখ চশমা থেকে অনেকখানি দূরে। লোকটির মাথার চুল খুব পাতলা। কপালের অনেকখানি পুরোপুরি ফাঁকা। হয়ত আগে কখনো অপরিচিত মেয়ে নিয়ে বের হয়নি। এই ধরনের পুরুষ বেশ ভাল। এরা কিছুতেই জড়তা কাটাতে পারে না। অসম্ভব ঘাবড়ে যায়। এবং এক সময় বিব্রত গলায় বলে, তুমি চলে যাও আমার কিছু লাগবে না। কেউ কেউ আবার হঠাৎ করে মহাপুরুষ সেজে ফেলে। গাম্ভীর গলায় বলে, তোমার মত মেয়ে এই লাইনে কেন? এই সব ছেড়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হও। এখনো সময় আছে। তারপর বলে বাড়িতে আছে কে? ফ্যামিলি মেম্বার কত? এই লাইনে আসবার কারণটা কি? না–সোসাইটিটা একবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই লম্বামুখো মানুষটা কি বলবে কে জানে। উদ্ভট কিছু করবে কি? বিচিত্র নয়। নার্ভাস ধরনের পুরুষ প্রায় সময়ই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে। বুড়ো ধরনের এক লোক একবার

কাঁদো কাঁদো। গলায় বলল–কিছু মনে করো না। তুমি আমার মেয়ের মত। বিশ্রী অবস্থা। এ জাতীয় বিশ্রী অবস্থা মনে হচ্ছে এবারও হবে।

লোকটি একটির পর একটি সিগারেট টেনে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া টানার ভঙ্গি, সিগারেটের ছাই ফেলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এ সিগারেট খায় না। তারা মগবাজারের একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে আছে। এগুলিকে বলে ফ্যামিলি রুম। বেলা তিনটা চারটার দিকে ফ্যামিলি রুমগুলি ভর্তি হয়ে যায়। বয় পর্দা টেনে দেয়। হুঁট করে ঢুকে পর্দা-ঘেরা মানুষগুলোকে বিরক্ত করে না। যার জন্যে মোটা বিকশিস পাওয়া যায়।

লোকটি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুচছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এর বেশি কিছু না।

তোমার নাম কি?

সে প্রশ্নটা করল তিথির দিকে না তাকিয়ে। তিথি বলল আমার নাম দিয়ে তো আপনার কোনো দরকার নেই। লোকটি এই উত্তর হয়ত আশা করেনি। কেমন হচকচিয়ে গেল।

আমি আগে কখনো এভাবে কারো সঙ্গে আসিনি। আমার ইচ্ছাও ছিল না। আমি একজন ফ্যামিলি ম্যান। আমার কোনো বদ অভ্যেস নেই। মাঝে-মধ্যে সিগারেট খাই। আগে পান খেতাম জর্দা দিয়ে। ডাক্তার বলল জর্দাটা হার্টের জন্য খুব খারাপ। সিগারেটের চেয়েও খারাপ, তাই পানও ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্যি এমনিতে পানটা কিন্তু খারাপ না, ভিটামিন সি আছে। ভিটামিন সি-টা শরীরের জন্যে খুবই দরকার।

তিথি বলল, আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?

লোকটি অস্বস্তিতে রুমাল দিয়ে নাক ঘষতে লাগল। যেন খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। কি করবে–কি বলবে বুঝতে পারছে না।

তুমি গান জানো?

না, জানি না। আর জানলেও আপনি নিশ্চয়ই চান না। এখানে আমি একটা গান শুরু করি। না-কি চান?

না না, তা চাই না। সব কিছুরই একটা সময় আছে। তুমি বস। আমি সিগারেট নিয়ে আসি। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

একজন বয়কে বললেই এনে দেবে। আপনার যেতে হবে না।

না থাক, আমিই যাচ্ছি।

লোকটি দ্রুত বের হয়ে গেল। তার চলে যাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল সে আর ফিরবে না। না ফিরলে মন্দ হয় না। তিথির ঘুম পাচ্ছে। সে মনে মনে ঠিক করল মিনিট দশেক অপেক্ষা করে চলে যাবে। না লোকটি চলে যায়নি। সিগারেট নিয়ে ফিরছে। মুখ ভর্তি পান। তার গায়ের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে পানের পিকের দাগ। অথচ একটু আগেই বলছিল– পান খায় না। তিথি বলল, আপনি কি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন? নাকি সারাক্ষণ এখানেই কাটাবেন?

লোকটি খুবই অবাক হয়ে বলল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?

সে তো আপনি ঠিক করবেন। কোনো হোটেলে কিংবা আপনার বাসায়।

কি সর্বনাশের কথা! বাসায় আমার স্ত্রী আছে–বড় মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আজিমপুর গার্ল স্কুলে। ফরিদা যদি এইসব ব্যাপারে কিছু জানতে পারে তাহলে সে আমাকে কিছু বলবে না। সোজা ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে। ফরিদা হচ্ছে আমার স্ত্রীর নাম।

বুঝতে পারছি।

খুবই চমৎকার মেয়ে। আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী। এখন অবশ্যি শরীরটা খুবই খারাপ। বছর তিনেক ধরে বিছানায় পড়ে আছে। একেবারে কংকাল। ডাক্তার খুব খারাপ ধরনের অসুখ বলে সন্দেহ করছে। বাঁচবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। ইয়ে তোমার নামটা কিন্তু বলনি।

আমার নাম পরী।

বাহ সুন্দর নাম।

এটা আমার আসল নাম না। নকল নাম।

নামের আবার আসল-নকল আছে নাকি?

কেন থাকবে না। মানুষের মধ্যেও তো আসল মানুষ নকল মানুষ আছে। যেমন আমি একজন নকল মানুষ।

ভদ্রলোক মনে হচ্ছে খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। সে বেশ খানিক্ষণ চুপচাপ থেকে আচমকা বলল, তুমি ঠাণ্ডা কিছু খাবে? ফান্টা কিংবা পেপসি?

না।

খাও, একটা ফান্টা খাও। এই বয়, দু'টা ফান্টা দাও। আমি আবার ফান্টা ছাড়া কিছু খেতে পারি না। কোক পেপসি এইসব আমার কাছে ওষুধের মত লাগে। আমার নাক আবার খুব সেনসেটিভ। ফরিদাও আমার মত। মানে ওর নোকও খুব সেনসেটিভ। দুধের কোনো জিনিস খেতে পারে না, গন্ধ লাগে। অথচ দুধটা এখন তার খাওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি কি দুধে গন্ধ পাও?

তিথি হেসে ফেলল।

লোকটি বিব্রত স্বরে বলল, আমি খুব আবোল-তাবোল কথা বলছি তাই না?

না ঠিক আছে। বলুন, যা বলতে ইচ্ছা করে। শুধু ছ'টার আগে ছেড়ে দেবেন। আমি অনেক দূরে থাকি।

কোথায় থাক?

তা দিয়ে তো আপনার দরকার নেই। আপনি নিশ্চয় আমার বাসায় বেড়াতে যাবেন না। না-কি যাবেন?

তুমি ঐসব মেয়েদের মত না। তুমি অন্য রকম।

আপনি কি ঐসব মেয়েদের সঙ্গে আগেও মিশেছেন?

না।

তাহলে বুঝলেন কি করে, ঐসব মেয়েরা কেমন?

না মানে যে রকম ভেবেছিলাম তুমি সে রকম না। অন্য রকম।

কি রকম ভেবেছিলেন?

লোকটি জবাব দিল না। রুমাল দিয়ে মাথা ঘষতে লাগল। তিথি বলল, গল্প করতে চাচ্ছিলেন গল্প করুন। চুপ করে বসে আছেন কেন?

না মানে ওঠা দরকার, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পাঁচটার সময় অ্যায়েন্টমেন্ট। তোমাকে ওরা টাকা দিয়ে দিয়েছে তো?

হ্যাঁ।

ভাল, খুব ভাল। খুবই ভাল।

চলুন, তাহলে উঠি। পাঁচটা বাজতে দেরি নেই।

আরেকটু বস। এই ধর দশ মিনিট। অবশ্যি তোমার যদি কোনো কাজ না থাকে।

আমার কোনো কাজ নেই।

লোকটি ভয়ে ভয়ে তার একটা হাত তিথির ডান হাতের উপর রাখল। রেখেই সরিয়ে নিল। মনে হচ্ছে এই কাজটি করে সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

তিথি বলল, আপনার টাকাটা তো মনে হচ্ছে জলে গেল।

লোকটি নিচু গলায় বলল, তুমি একটি চমৎকার মেয়ে।

আমি চমৎকার মেয়ে, এটা আপনাকে বলল কে?

বোঝা যায়। চেহারা দেখে বোঝা যায়।

আচ্ছা। আপনি কি করেন?

ছোটখাটো ব্যবসা করি। তেমনি কিছু না। তবে খারাপ ও না। গত বছর গাড়ি কিনলোম একটা। তবে আমি অবশ্যি গাড়িতে চড়ি না। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। রিকশাটা এদিক দিয়ে ভাল। হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যায়।

পাঁচটা বেজে গেছে–চলুন উঠি।

তুমি আগে যাও, আমি পরে আসছি।

কেউ দেখে ফেলবে সে জন্যে?

লোকটি তার জবাব দিল না। তিথি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি কি আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন? আমি এসএসসি পাস করেছি।

কি রকম চাকরি?

যে কোন চাকরি। টাইপিস্টের চাকরি বা এই জাতীয় কিছু।

টাইপিং জানো?

জি-না। তবে আমি শিখে নিতে পারব। আমি খুব দ্রুত শিখতে পারি।

আমার কাছে কোনো চাকরি নেই। আমার অফিসে অল্প কিছু কর্মচারী আছে নতুন লোক নেওয়ার অবস্থা অফিসে নেই। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

হঠাৎ করে সুন্দরী একটা মেয়েকে চাকরি দিলে নানান কথা উঠবে। আমার স্ত্রী শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে। আমাকে অবশ্যি কিছু বলবে না।

ছাদ থেকে লাফিয়েও পড়তে পারে, তাই না?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে নিচু গলায় বলল, এইখানে ঠিকানা আছে, দবির উদ্দিন বি.এ। দবির ইন্ডাস্ট্রিজ ৩১/৩ জিগাতলা, তুমি মাস তিনেক পর একবার খোঁজ নিও।

মাস তিনেক পর খোঁজ নিতে বলছেন কেন? আপনার কি ধারণা মাস তিনেকের মধ্যেই আপনার স্ত্রীর ভালমন্দ কিছু হয়ে যাবে?

লোকটি শীতল গলায় বলল, তোমাকে যতটা ভাল মেয়ে আমি ভেবেছিলাম ততটা ভাল তুমি না। তোমার মত মেয়ে যে রকম সাধারণত হয় তুমিও সেই রকমই। আলাদা কিছু না।

তিথি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আমাকে রাগিয়ে দেয়াটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কার্ডে আপনার বাসার ঠিকানা আছে। সেই ঠিকানায় যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যাই তখন কি হবে?

দবির উদ্দিন জবাব দিল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

তিথির ঠোঁটে এখন আর হাসি নেই। সে কৃঠিন চোখে তাকাচ্ছে। দবির এই মেয়েটির দ্রুত ভাবান্তরের রহস্য ধরতে পারছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তিথি নিচু গলায় বলল, পুরো টাকাটা জলে ফেলবেন কেন? কিছুটা অন্তত উসুল হোক। ব্লাউজ খুলে ফেলছি, আপনি আমার বুকে হাত দিন। আর যদি তাও না চান অন্তত তাকিয়ে দেখুন। আপনার অসুস্থ স্ত্রীর বুক নিশ্চয়ই আমার বুকের মত সুন্দর না।

দবিরের চেহারা ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। সে অল্প অল্প কাঁপছে। তিথির মুখের কঠিন ভাজগুলি হঠাৎ সতেজ হয়ে গেল। সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি চমৎকার মানুষ। চলুন, আমরা যাই।

৪. বাড়িটা ইসমাইল সাহেবের

হীরুকে ঘণ্টাখানিক ধরে একতলা একটা টিনের ঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। এই এক ঘণ্টায় বাড়ির কাছাকাছি এসে কয়েকবার তীক্ষ্ণ শিস দিয়েছে। দুবার ইটের টুকরা টিনের চালে ফেলেছে। এসব হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। চেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছে না। কেউ বেরুচ্ছে না বা জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে না।

বাড়িটা ইসমাইল সাহেবের।

ইসমাইল সাহেব মীরপুর কৃষি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। তাঁর ছয় মেয়ে। এই ছ'মেয়ের তৃতীয়জনের নাম এ্যানা। এ্যান্য এই বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট হয়নি। এখন রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষার কাল চলছে। হীরুর শিস এবং চালে ঢিল সবই এ্যানার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় দফায় ঢিল এবং শিস দেবার সঙ্গে সঙ্গে বসার ঘরের একমাত্র খোলা জানালাটাও বন্ধ হয়ে গেল। হীরু চাপা গলায় বলল, হারামজাদী। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। এ্যানার কাণ্ডকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। হারামজাদী আজ বেরুচ্ছে না কেন? বাবা বাসায় আছে নাকি?

হীরু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পরপর তিনটা স্টার সিগারেট খেয়ে ফেলল। বুক পকেটে একটা বিদেশী ফাইভ ফাইভ আছে। সে ঠিক করে রেখেছিল–এ্যানা বের হলে এটা ধরানো হবে। এখন মনে হচ্ছে হারামজাদী বেরুবে না। অবশ্যি তার হয়ত দোষ নেই। ছোটলোক বাপ হয়ত ঘরে বসে। আছে। এই ছোটলোকটা প্রায়ই অফিস কামাই করে। ঘরে বসে বসে ঝিমায়। যার ছটা মেয়ে এবং সাত নম্বর মেয়ে স্ত্রীর পেটে বড় হচ্ছে তার বিমানো ছাড়া

গতি কি? হীরু কয়েকবার দেখেছে এ্যানার মাকে। রোগা কাঠি। শ্যাওড়া গাছের ডালে এলোচুলে বসে থাকলেই এ মহিলাকে বেশি। মানাতো। তা না করে তিনি কল্যাণপুরের একটা টিনের ঘরে বাস করেন এবং ভাঙা গলায় সারাক্ষণ ছয় কন্যাকে বকাঝকা করেন। হীরু নিজেও একবার বিকা খেয়েছে।

এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে একবার ছোট্ট করে শিস দিতেই এই মহিলা জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, এই ছেলে তুই কি চাস?

হীরু হতভম্ব!

এই যুগে তার বয়েসী কোনো ছেলেকে কোনো মেয়ের বা যে তুই করে বলতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি। সে এতই অবাক হল যে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা তার ভাঙা গলায় তিনবার বললেন, চাস কি তুই? রোজ জানালার সামনে শিস! জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

হীরু থেতমত খেয়ে বলল, কিছু চাই না ম্যাডাম। একটা অ্যাডড্রেস খুঁজছি। সতের বাই তিন। ইকবাল সাহেবের বাসা। এটা কি ইকবাল সাহেবের বাসা?

মহিলা খট করে জানালা বন্ধ করে দিলেন। হীরুর প্রায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা। একি যন্ত্রণা!

এই বাড়ির মেয়েগুলিও হয়েছে মায়ের মত। সব কটা মেয়ে পুরুষদের মত গলায় কথা বলে। চেহারাও পুরুষদের মত। হাবভাবও সে রকম। হীরু যে এদের একজনের জন্যে

রোজ এতটা সময় নষ্ট করে এতেই এদের কৃতার্থ থাকা উচিত। হীরুর ধারণা নরম্যাল পদ্ধতিতে এদের একটারও বিয়ে হবে না। প্রেম-টেমা করে যদি দু'একটা পার পায়। অথচ বাপ-মা এই জিনিসটাই বুঝে না।

এ্যানার বাবা ইসমাইল সাহেবের কাজকর্ম একজন জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মত। যতক্ষণ বাসায় থাকবেন কোনো মেয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। উকি-কুঁকি দিতে পারবে না। ঘরের জানালা থাকবে বন্ধ। আজকের লক্ষণও সে রকম। হীরু ঠিক করল। মীরপুর গিয়ে দেখে আসবে। ভদ্রলোক অফিসে গেছেন না। ছুটি নিয়ে বাসায় বসে আছে। যদি অফিসে না গিয়ে থাকেন তাহলে তো কিছুই করার নেই। আর যদি দেখা যায়। ভদ্রলোক অফিসেই আছেন তাহলে আরেকটা এটেম্পট নেয়া যায়। এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক না।

ভদ্রলোক অফিসেই আছে। বিশাল চেহারা। ব্যাঙের চোখের মত বড় বড় চোখ। কচকচ করে পান খাচ্ছে। হীরু মনে মনে বলল, খাঁ ব্যাটা পান খা। আর প্রতি বছর একটা করে মেয়ে পয়দা করা। বলেই হীরুর মনে হল–বলাটা ঠিক হল না। তার শ্বশুর হবার একটা ভীষণ সম্ভাবনা এই কোলা ব্যাঙের আছে। হবু শ্বশুর সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করা ঠিক না। শ্বশুরদের সম্পর্কে ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা দরকার। তবে এই লোক তার শ্বশুর হলেও বিপদ আছে। ঈদের দিন কোলাকুলি করতে হবে।

হীরু একটা রিকশা নিয়ে নিল। মীরপুর থেকে কল্যাণপুর ফেরার এই সময়টায় বাসে গাদাগাদি ভিড় থাকে। এ্যানার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ইস্ত্রী করা শার্ট পরে এসেছে।

চাপাচাপিতে শার্ট ভর্তা হয়ে যাবে। রিকশা ভাড়ায় বাড়তি টাকা চলে যাচ্ছে। উপায় আর কি?

এ্যানার সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়। আড়াই মাসের মত। পরিচয় পর্বটা খারাপ না। এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় দিন। হীরু মীরপুর রোডে এসে দাঁড়িয়েছে কি করবে। ঠিক বুঝতে পারছে না। বছর তিন চারেক আগে এই সময়ে মেয়েদের স্কুলে নকল সাপ্লাই করত। বয়সের কারণে এটা এখন মানায় না। তবু পরীক্ষার সময় গম্ভীর মুখে একবার ঘুরে আসে। অনেক দিনের অভ্যাস। চট করে ছাড়া মুশকিল।

হীরু ভাবছিল কোন স্কুলে যাবে। আশপাশের সব কটা সেন্টার ঘুরে দেখা দরকার। রোজ রোজ একই সেন্টারে যাবার কোনো মানে হয় না। এই রকম যখন তার মনের অবস্থা তখনি এ্যানাকে তার চোখে পড়ল। বেচারী রিকশা পাচ্ছে না। কোনো রিকশা নেই। যাও আছে যাত্রী বোঝাই। মেয়েটা ছোটাছুটি করছে রিকশার জন্যে। ব্যাপারটা দেখতেই হীরুর বেশ মজা লাগছে। মেয়েটা দারুণ ভয় পেয়েছে। তার হাত থেকে এক সময় জ্যামিতি বাক্স পড়ে গেল। চাদা, কম্পাস এসব ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে। সে বসে বসে এইসব তুলছে এবং চোখ মুছছে।

একটা রিকশাওয়ালাকে পাওয়া গেল–সে দশ টাকা ভাড়া চায়। মেয়েটার সঙ্গে বোধ হয় দশ টাকা নেই। সে অনুনয়-বিনয় করছে সাত টাকায় যাবার জন্যে।

হীরুর এতক্ষণ বেশ মজাই লাগিছিল এখন খানিকটা খারাপ লাগল–সব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কয়েকজন করে আত্মীয়-স্বজন থাকে। ও যাচ্ছে একা এবং সঙ্গে দশ টাকাও নেই।

হীরু তখন এগিয়ে গেল। গলার স্বর যথাসম্ভব গভীর করে বলল, খুকী আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে নাও। এক সময় দিয়ে দিলেই হবে। আমি এই দিকেই থাকি।

মেয়েটি শীতল চোখে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমার কাছে টাকা আছে। আর যদি নাও থাকে। আপনার কাছ থেকে নেব কেন?

হীরু হতভম্ব। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল। মেয়েটি বলল, পাঁচ টাকা ভাড়া হয় আমি শুধু শুধু তাকে দশ টাকা দেব কেন?

তা তো বটেই। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি।

তোমার কোন স্কুলে সিট পড়েছে?

মেয়েটি জবাব না দিয়ে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল। একটা বাস এসে থেমেছে। বাসে যথেষ্ট ভিড়। বাস স্ট্যান্ডেও অপেক্ষমাণ ছোটখাটো জনতা। মেয়েটি সেই ভিড় কাটিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

দূর থেকে হীরু মনে মনে বলল–সাবাস। বলেই তার খেয়াল হল যে তার পকেট ফাঁকা একটা টাকাও নেই। মেয়েটা যদি তখন বলত–দিন দশটা টাকা, তাহলে উপায়টা কি হত?

মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি সময় লাগল না। দেখা হলে সে কথা বলে। হীরু ঘুরিয়েফিরিয়ে দু'একটা রোমান্টিক কথাও বলেছে তেমন কোনো রি-অ্যাকশান অবশ্যি তাতে বোঝা যায়নি। এর মধ্যে একটা ডায়ালগ ছিল এ রকম আজ তো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

মেয়েটি হেসে ফেলল বলেছে–শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলেন কেন? যে সুন্দর না তাকে সুন্দর বললে তার খুব খারাপ লাগে . এটা আপনি জানেন?

মেয়েটার এইটাই হচ্ছে একটা সমস্যা। ফটফট করে কথা বলে। বেশি চালাক। মেয়েছেলের বেশি চালাক হওয়া ঠিক না।

হীরু এ্যানাদের বাসার ঠিক সামনের রিকশা থেকে নামল। রিকশায় আসতে আসতে সে ঠিক করে। রেখেছে–এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কয়েকবার কাশবে। যক্ষ্মারুগীর কাশি না–ভদ্র কাশি। যাতে এ্যানা ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বের হয়ে আসে।

হীরুকে কাশতে হল না। সে দেখল এ্যানা বাসার সামনের দোকান থেকে কি যেন কিনছে। এদের বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই বলে দোকানের টুকটাক বাজার মেয়েদেরই করতে হয়। হীরু এগিয়ে গেল।

এ্যানা আধ কেজি চিনি কিনছে। হীরু গম্ভীর মুখে দোকানদারকে বলল, পাল্লাটা ঠিকমত ধরেন ভাইজান। পাল্লায় ফের আছে? নগদ পয়সায় পারলিক জিনিস কিনবে আর আপনি পারলিককে ঠকাবেন তা তো হয় না।

এ্যানা বলল, নগদ পয়সায় কিনছি না; বাকিতে কিনছি।

বলেই হীরুকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে চিনির ঠোঙা হাতে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। যেন হীরুকে সে চেনে না। যেন হীরু রাস্তার একটা ছেলে। হীরু মনে মনে বলল, হারামজাদী।

তার মন খারাপ হয়ে গেল। আজ দিনটাই তার জন্যে খারাপ। হোতও পুরোপুরি খালি। যে সামান্য কিছু টাকা ছিল তার সবটাই রিকশা ভাড়ায় চলে গেছে। শখানেক টাকা সঙ্গে না থাকলে কেমন অস্থির লাগে। কোথায় পাওয়া যায় টাকা? হীরু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল– ঢাকায় ধার চাওয়ার মত আত্মীয়স্বজন কে কে আছে যাদের কাছ থেকে এখনো ধার চাওয়া হয়নি। তেমন কারোর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। উত্তর শাহজাহানপুরে দূর-সম্পর্কের এক মামা আছেন। তার কাছে যাওয়া যায়। তবে ঐ ভদ্রলোকের নিজেরই দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। ধার চাইতে গিয়ে কোনো বিপদে পড়তে হয় কে জানে।

হীরু জমা করে রাখা বিদেশী সিগারেটটা বের করল। জমা করে রাখার কোন অর্থ হয় না।

সে সিগারেট ধরিয়ে দু'টা টান দিয়েছে তখন দেখা গেল এ্যানা আবার আসছে। এবং তার কাছেই যে আসছে এটাও নিশ্চিত। হীরু ঠিক করে রাখল কোনো কথা বলবে না। যে

মেয়ে তাকে অপমান করে, দেখতে পেয়েও না দেখার ভান করে চলে যায় তার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না।

এ্যানা এসে হীরুর সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটাকে হীরুর সত্যি সত্যি সুন্দর লাগছে। যত দিন যাচ্ছে মেয়েটা কি ততই সুন্দর হচ্ছে? তা কেমন করে হয়?

এ্যানা বলল, এরকম বিশ্রী করে শিল দিচ্ছিলেন কেন? কতবার না বললাম। এ রকম করবেন। না। আর ছাদে ঢিল মারলেন কেন? এইসব কি?

কথা না বলার প্রতিজ্ঞা টিকল না। হীরু বলল, মন-মেজাজ খুব খারাপ মাথার ঠিক নাই। কি করতে কি করি।

মাথার ঠিক নাই কেন?

আর বলে না, ছোট ভাই মিসিং হয়ে গেছে। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি সব তো আমার ঘাড়ে। বড় ছেলে হবার বিরাট যন্ত্রণা।

আপনার ছোট ভাই হারিয়ে গেছে নাকি?

হুঁ, পালিয়ে গেছে। যাকে বলে....

হীরু থেমে গেল। সে পালিয়ে গেছের একটা ইংরেজি বলতে চেয়েছিল–বলতে পারছে না। কারণ পালিয়ে গেছের ইংরেজি তার জানা নেই।

এ্যানা বলল, পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

না, পুলিশ-ফুলিশে হবে না। পীর সাহেবের কাছে যেতে হবে। কলতা বাজারের পীর। জ্বীন সাধনা আছে। আমার সঙ্গে খুবই খাতির। অত্যন্ত স্নেহ করেন।

এ্যানা বলল, আপনাকে স্নেহ করেন? আপনাকে স্নেহ করার কি আছে?

হীরুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই মেয়ে বলে কি? কষে একটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। যে সব চমৎকার কথা বলবে বলে হীরু এসেছিল তার সবই এলোমেলো হয়ে গেল। হীরু বলল, যাই তাহলে?

আচ্ছা।

দিন পনের দেখা হবে না। ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। বিজনেসের ব্যাপার।

যান, বিজনেস করে আসুন।

তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো, সময় যদি পাই একটা চিঠি-ফিটি ছেড়ে দেব।

চিঠি দিতে হবে না। বাবা জানলে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

হীরুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মন খুব বেশি খারাপ হলে সে সাধারণত পীর সাহেবের কাছে যায়। আজ তাও যাওয়া যাবে না, হাত একদম খালি। পীর সাহেব টাকা-পয়সা কিছুই নেন না। তবে বিদেশী সিগারেট দিলে খুশি হন। এক প্যাকেট বেনসনের দাম কম হলেও পাঁচ পঞ্চাশ টাকা ... এই টাকাটা সে পাবে কোথায়?

হীরু ভেবে পেল না তার এবং এ্যানার ব্যাপারটা সে পীর সাহেবকে বলবে কি বলবে না। লজ্জা লজ্জা করে তবে একবার বলে ফেললে চির জীবনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

তাছাড়া টুকুর জন্যেও যাওয়া দরকার। হারানো মানুষ বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই পীর হচ্ছে এক নাম্বার। পীর সাহেবের এগারটা জ্বীন আছে। জ্বীনের মারফত খবর পান।

হীরু খালি হাতেই পীর সাহেবের সন্ধানে রওনা হল।

৫. টুকু পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে

টুকু পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে।

তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের আরামদায়ক আলস্য। শুধু মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এসব হচ্ছে প্রবল জ্বরের লক্ষণ। সে বুঝতে পারছে তার গায়ে জ্বর। অনেকখানি জ্বর। জ্বরের জন্যেই শ্রাবণ মাসের পড়ন্ত দিনের রোদ তার কাছে এত আরামদায়ক মনে হচ্ছে। রোদটা আরেকটু কড়া হলে ভাল হত। শীত শীত ভাবটা দূর হত।

টুকু চোখ মেলল। আকাশ অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। সকালে প্রথম যখন জ্বরের ভাবটা টের পেল। তখন থেকেই সে লক্ষ্য করছে আকাশ ক্রমশ নেমে আসছে। বাসায় যখন জ্বর আসত তখনো এমন হত। মনে হত ছাদটা নিচে নেমে এসেছে। এখন মাথার উপর ছাদ নেই। চকচকে আকাশ। সে আকাশ এত দ্রুত নিচে নামছে যে তার ভয় ভয় করছে। টুকু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আজ নিয়ে দু'দিন সে পানি ছাড়া কিছু খায়নি। ইচ্ছা করলে খেতে পারত। তার পকেটে সতের টাকা। এই জীবনের পুরো সঞ্চয়। এই টাকার সবটাই সে পেয়েছে তিথির কাছ থেকে। যতবার সে তিথিকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে ততবার বাসে উঠবার আগে হাত ব্যাগ খুলে তিথি তাকে একটা টাকা দিয়ে বলেছে নে রেখে দে। টুকু প্রতিবার বলেছে লাগবে না। তিথি বলেছে, না লাগলেও রেখে দে। টুকুর একচল্লিশ টাকার মত জন্মেছিল। বাকি টাকাটা খরচ হয়েছে গ্রিন বয়েজ ক্লাবের চাঁদায়। এই ক্লাবটা নতুন হয়েছে। ক্লাবের সেক্রেটারি বজলু ভাই। উকিল সাহেবের বাড়ির গ্যারেজে ক্লাবের অফিস ঘর এবং

লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা একশ আটান্ন। লাইব্রেরিতে ভর্তি হবার নিয়ম হল–একটা বই দিতে হবে এবং ভর্তি ফি দশ টাকা দিয়ে মেম্বার হতে হবে। মেম্বারা হয়ে গেলে প্রতি মাসে চান্দা তিন টাকা।

টুকু এই লাইব্রেরির প্রথম সদস্য। শুধু তাই না–গ্রিন বয়েজ ক্লাবের মাসিক মুখপাত্র নতুন দেশ-এর সে একজন চিত্রকর। এই খবর টুকুদের বাসায় কেউ জানে না। কেউ জানে না টুকু শুধু যে একজন চিত্রকর। তাই না সে গল্পও লেখে; একটি গল্প ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম রাজকন্যা চম্পাবতী। রূপকথা; রূপকথা লিখতেই টুকুর ভাল লাগে। তার মাথায় এই জিনিসই ঘুরে বেড়ায়।

ভোরবেলায় সে যখন বাড়ি থেকে বেব হল তখনো তার মাথায় ছিল একটা রূপকথার গল্প। যেন সে একজন রাজকুমার। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হয়েছে। বের হবার কারণ ভয়ংকর একটা দৈত্য। দৈত্যটার নাম করুবেক। এই করুবেক দৈত্যের ভয়ে সমস্ত পৃথিবী থারথার করে কাঁপছে। একে কেউ মারতে পারছে না। কারণ করুবেক অমর। শুধু একজন পারে করুবেককে মারতে–সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তবে তার জন্যে তাকে সাধনা করতে হবে। সাতদিন উপবাস। উপবাসের অষ্টম দিনে তার কাছে আসবেন একজন দেবদূত। তিনি নরম গলায় বলবেন–হে বালক! তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি চাও বৎস? তিনটি বির তুমি প্রার্থনা কর। সে তখন চাইবে করুণাবেককে হত্যার অস্ত্র।

টুকুর উপবাসের আজ দ্বিতীয় দিন।

প্রথম দিন সে কষ্টটা হচ্ছিল আজ তা হচ্ছে না। টুকুর ধারণা আগামী দিন আরো কম হবে। বাসায় থাকলে কষ্ট হত। ক্ষিধের এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। বাসায় থাকলেই ক্ষিধে

বেশি লাগে এবং যখন জানা যায় ঘরে খাবার নেই তখন হঠাৎ করে ক্ষিধের কষ্ট লক্ষগুণ বেড়ে যায়। জগৎসংসার অন্ধকার মনে হয়।

এরকম কষ্ট অবশ্যি টুকুকে খুব বেশি করতে হয়নি। এই জীবনে মাত্র তিনবার। প্রথমবার যখন ব্যাপারটা হল তখন কষ্টের চেয়েও বিস্ময় প্রধান হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ এক'দিন দুপুরকেলা রান্না হল না। টুকুর বাবা বারান্দায় বসে বারবার বলতে লাগলেন–ভেরি ব্যাড টাইম। যাকে বলে দুঃসময়। কি করা যায়? না খেয়ে তো থাকা সম্ভব না। ও মিনু, করা যায় কি বল তো?

টুকুর মা রান্নাঘরের বারান্দায় মোড়াতে বসা ছিলেন। সেখান থেকে তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন–তুমি কথা বলবে না।

জালালুদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন–কথা না বললে হবে কি করে? একটা বুদ্ধি বের করতে হবে না? চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে?

খবরদার একটা কথা না।

তোমাকে নিয়ে বড় যন্ত্রণা হল তো? সমস্যা বুঝতে পারছি না। মানব জীবনে সমস্যা আসবেই। সেই সমস্যার সমাধান ঠাণ্ডা মাথায় বের করতে হবে। কুল ব্রেইনে ভাবতে হবে।

সমস্যার সমাধান বের করা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

জালালুদ্দিন উৎসাহী গলায় বললেন, কি সমাধান?

ঘরে ইদুর মারার বিষ আছে। ঐ খানিকটা করে খেয়ে শুয়ে থাক।

পাগল হয়ে গেলে নাকি মিনু?

পাগল হইনি, পাগল হব কেন?

আত্মহননের চিন্তা যে মাথায় এসেছে এটাই হচ্ছে পাগলামির সবচেয়ে বড় লক্ষণ। বড় বড় মনীষীদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

আর একটা কথা যদি তুমি বল জোর করে তোমাকে বিষ খাইয়ে দেব। সব সময় ফাজলামি।

জামালুদ্দিন চুপ করে গেলেন।

টুকুরও ভয় ভয় করতে লাগল। মার চেহারা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। রূপকথার ডাইনীদের মত লাগছে।

হীরু বাড়ি এল সন্ধ্যার আগে আগে। মুখ ভর্তি পান। হাতে সিগারেট। দুপুরে বাড়িতে খাওয়া হয়নি। শুনে সে চোখ কপালে তুলে বলল বিগ প্রবলেম মনে হচ্ছে।

জালালুদ্দিন বললেন, তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে নাকি রে হীরু?

আমার কাছে টাকা-পয়সা থাকবে কেন? কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় পকেটে হাত দিয়ে চেক করতে পার। পাঁচটা টাকা ছিল এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম।

জালালুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন–দেখি একটা সিগারেট দে। সিগারেটেরা ক্ষিধে নষ্ট হবার ক্ষমতা আছে।

জালালুদ্দিন বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। তার সামনেই বসল হীরু। কিছুক্ষণ পরপর সে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। কপালের রাগ টিপে ধরছে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে জালালুদ্দিন বলতে বাধ্য হলেন এত চিন্তা করিস কেন? এত চিন্তার কি আছে? রিজেকের মালিক হচ্ছেন আল্লা স্বয়ং। সেই রিজিক নিয়ে বেশি চিন্তা করার মানেই হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা। মহোপাপের সামিল।

আল্লাহর ওপর প্রবল বিশ্বাস রেখে তিনি হীরুর কাছ থেকে নিয়ে পরপর তিনটি সিগারেট খেয়ে ফেললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার–দেখা গেল স্বয়ং আল্লাহ জালালুদিনের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন। মিনু কোনো-এক গভীর গোপন থেকে গলার একটা হার বের করলেন। কি করে এটা অবশিষ্ট রয়ে গেল কে জানে। দুভরি থেকে আড়াই ভরির মত ওজন।

জালালুদ্দিন একগাল হাসলেন। হষ্টচিত্তে বললেন–কি বলেছিলাম না। সব সমস্যার সমাধান আছে। বিশ্বাস তো কর না।

হীরু, গয়না নিয়ে বেরুলি। আগেরগুলিও তার হাতেই বিক্রি হয়েছে। তার নাকি কোন-এক চেনা দোকান আছে। ভাল দাম দেয়। খাদের জন্য কিছুই কাটে না।

জালালুদ্দিন বললেন, ঐ সঙ্গে সপ্তাহের বাজার করে আনবি, বুঝলি। চাল, ডাল, চা চিনি। নোনা ইলিশ পাস কি-না দেখবি। কচুর লতি দিয়ে নোনা ইলিশের কোনো তুলনা হয় না। একেবারে বেহেশতী খানা–বুঝলি। হীরু গয়না নিয়ে বেরুল আর ফিরল না।

বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে টুকু পুরনো কথা ভাবছে। ভাবতে বেশ মজা লাগছে। হীরু ভাইয়া না যে চরায় বাবা ঐ রাতে কি অবাকই না হয়েছিলেন। রাত এগারটার দিকে ভয় পাওয়া গলায় বললে, ন, ও মিনু গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল নাকি?

মিনু সহজ গলায় বললেন–হ্যাঁ।

এখন কি করব?

ঘুমিয়ে পড়। আর কি করবে?

বল কি তুমি!

মিনু সত্যি সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করলেন। মশারি ফেলতে ফেলতে বললেন–ঘুমুতে না। চাও জেগে থাকে। রিজিকের জন্যে আল্লাহকে ডাক। তিনি ব্যবস্থা করবেন।

ক্ষুধার্তমানুষ ঘুমুতে পারে না বলে প্রচলিত যে ধারণা আছে তা ঠিক না। ক্ষুধা পেলে ঘুম ভাল হয়। ঐ রাতে শোয়ামাত্র টুকু ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তিনটার দিকে তার ঘুম ভাঙানো হল। ডাল-ভাত রান্না হয়েছে। আগুন গরম ভাত ফুঁ দিয়ে তার বাবা খাচ্ছেন। তাঁর মুখে

মিবলানন্দ। জানা গেল দুবেলার মত খাবার ঘরে ছিল। সামনের দিন কেমন যাবে তা বোঝার জন্যে মিনু এই ব্যবস্থা করেছে। সবাই আকণ্ঠ খেল। শুথু তিথি ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে রইল। কিছু মুখে দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, খাচ্ছিস না কেন?

তিথি বলল, রুচি হচ্ছে না। বাবা। তোমরা খাও।

দু'এক গাল মুখে দে। তাহলেই দেখবি রুচি হচ্ছে। ডাল কাঁচামরিচ দিয়ে ডলা দে দেখবি কি রকম টেস্ট হয়। মিনু ওকে একটা পেয়াজ দাও। ঘরে পেয়াজ আছে না?

তিথি বলল, না-খাওয়া অভ্যাস করি বাবা। সামনের দিনগুলিতে তো না খেয়েই থাকতে হবে। সে থালা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিনু একবারও তাকে খেতে ডাকলেন না।

আজ সকাল থেকে টুকুর মাথায় এসব ঘটনা ছবির মত আসছে। পাশাপাশি আসছে রূপকথার গল্পটা। টুকুর পায়ের কাছে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে কে-একজন এসে বসল। টুকুর মনে হল এ করুবেকের গুপ্তচর। তার সাধনা ভাঙাতে এসেছে। ঝালমুড়ির লোভ দেখাচ্ছে। যাতে সে লোভে পড়ে ঝালমুড়িওয়ালাকে ডেকে দুটাকার মুড়ি কিনে ফেলে। একবার কিনে ফেললেই সব শেষ। করুণবেককে হত্যা করা তখন আর সম্ভব হবে না।

লোকটি একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হইছে?

টুকু জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল। লোকটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল না। এই দুঃসময় কেউ বেশি প্রশ্ন করে না। বেশি প্রশ্ন করলেই যদি কাধে দায়িত্ব এসে পড়ে। দায়িত্ব খুব খারাপ জিনিস। এর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

টুকু একবার ভাবল, কেউ কি তাকে খুঁজতে বের হবে? সেই সম্ভাবনা কতটুকু? খুব বেশি না। খোঁজাখুঁজির যন্ত্রণায় কেউ যাবে না। একজন মানুষ কমে গেলেই সংসারের জন্যে ভাল। তবে বজলু ভাই খবর পেলে নিশ্চয়ই বের হবেন। এবং খুঁজে বের করতে পারলে খুশি খুশি গলায় বলবেন। তুই যে ঘর থেকে পালাতে পারলি এটা খুবই শুভ লক্ষণ। সব গ্রেটম্যানরাই কোনো না কোনো সময়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রবি ঠাকুর। বাড়ি থেকে পালাননি বলে তার লেখায় পুতপুত ভাবটা বেশি। বাড়ি থেকে পালালে অভিজ্ঞতা হয়। নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা যায়। গুড ম্যান, ব্যাড ম্যান সব ধরনের মানুষ। পরবর্তী সময়ে এইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। তোর জন্যে এটা তো খুবই দরকার। লেখালেখি লাইনে যখন আছিস। আমাদের দেশের লেখকরা বড় হতে পারল না কেন? অভিজ্ঞতার অভাবে। ম্যাক্সিম গোর্কির অভিজ্ঞতা কজনের আছে তুই বলা? একজনেরও নেই। আমাদের দেশের লেখকরা কি করে? খায় দায় ঘুমায় আর আডিডা দেয়। এদের একবিন্দু অভিজ্ঞতা নেই। আমি খুব খুশি যে তোর অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে টুকুর তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। সে নিজের মনে সময় কাটিয়েছে। বেশির ভাগ সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছে, কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। শুধু একবার একটা বুড়ি তাকে বলেছে–এই ছ্যামড়া তোর হইছে কি? শইলে কি জ্বর?

বুড়ির গলায় স্নেহ-মমতার লেশমাত্র নেই। টুকু সেই প্রশ্নের জবাব দেয়নি। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। বুড়ি আবার বলেছে, এই ছ্যামড়া উইঠ্যা ব দেহি। তোর বাড়ি কই?

টুকু বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে। নিজের পরিবারের মানুষদের বাইরের গত দু'দিন এই বুড়ি এবং ঝালমুড়ির ঠোঙা হাতে লোক–এদের দুজনের সঙ্গেই কথা হয়েছ। বিরাট কোন অভিজ্ঞতা নয়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে টুকু উঠে বসল। আকাশটা অনেকখানি নেমে আছে। আকাশের রঙ ঘন লাল। সন্ধ্যাবেলা আকাশ খানিকটা লাল হয়। এতটা লাল হয় নাকি? তার ধারণা হল জ্বর খুব বেড়েছে। এতটা বাড়তে দেয়া ঠিক হয় নি। সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুরে নিচে পড়ে গেল। মুড়ির ঠোঙা হাতের লোকটি তাকিয়ে দেখল। কিছুই বলল না। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল সে ঠোঙা ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সে হাঁটছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। দিনকাল ঘদলে যাচ্ছে। কেউ এখন আর বাড়তি ঝামেলায় যেতে চায় না।

৬. টুকুর খোঁজ নেই

দেখতে দেখতে ছ'দিন হয়ে গেল— টুকুর খোঁজ নেই। মিনু প্রায় দুপুরবেলা নিজেই ছেলেকে খুঁজতে বের হন। কাউকে তা বলেন না। টুকুর প্রসঙ্গে কোনো রকম কথাবার্তায় তিনি অংশগ্রহণ করেন না। যেন টুকু নামে তার কেউ ছিল না।

এই ক'দিন তিথি টুকুর প্রসঙ্গ তুলেনি। আজ তুলল। হীরুকে বলল, থানায় খবর দিয়েছিস?

হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, না।

না কেন?

আরে থানায় খবর দিয়ে হবেটা কি? কিছুই হবে না। উল্টা শালদের টাকা খাওয়াতে হবে।

টাকা খাওয়াতে হবে কেন?

পুলিশের কাছে যাবি আর টাকা খাওয়াবি না। এটা একটা কথা হল নাকি। পুলিশ সম্পর্কে তুই কিছুই জানিস না। থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারটা তুই ফরগেট করে ফেল।

আমরা কিছুই করব না? হাত গুটিয়ে বসে থাকব?

তোকে এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ব্যবস্থা নেযা হয়েছে।

কি ব্যবস্থা?

ঐসব জেনে তুই কী করবি? আমার ওপর ছেড়ে দে।

তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে তো এই অবস্থা...

হীরু কোনো উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে তাকে এখন সিগারেট কিনতে যেতে হবে। টুকু না থাকায় এই একটা সমস্যা হয়েছে ছোট ছোট কাজে নিজেকেই যেতে হচ্ছে। ভরা পেটে হাঁটতে ভাল লাগে না।

টুকুকে নিয়ে যে তিথি চিন্তা করছে এতেও সে বেশ মজা পাচ্ছে। পীর সাহেবের কথামত দশ দিনের দিন টুকুর ফিরে আসার কথা। আসবে সেটা তো প্রায় নিশ্চিত। কাজেই ছোটাছুটি হৈচৈ এর কোনো দরকার নেই। সিগারেট কিনতে কিনতে হীরুর মনে হল আজ কী একবার যাবে পীর সাহেবের কাছে? এমনি গিয়ে একটু কদমবুসি করে আসা আর কি?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরপরই মিনু বের হয়ে গেলেন। একটা ভবঘুরে কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছেন। পুলিশ ট্রাক ভর্তি ভিখিরি নিয়ে ঐখানে আটকে রাখে বলে শুনেছেন। কে জানে টুকুকেও রেখেছে কি-না!

তিনি ফিরলেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় তার বড় মেয়ে অরুর বর আব্দুল মতিন বসে আছে। রাগে মিনুর গা জ্বলে গেল। এ ছেলেকে দেখলেই তার এ রকম হয়।

আব্দুল মতিনের হাতে সিগারেট। শাশুড়িকে দেখে সিগারেট লুকাবার একটা ভঙ্গি করে উঠে এল। সিগারেট হাতেই পা ছুঁয়ে সালাম করল।

কেমন আছেন আম্মা?

মিনু শুকনো গলায় বললেন তুমি কখন এলে?

চারটার সময়। দেখি কেউ নাই। তখন থেকে একলা বসে আছি। বাসার আর লোকজন কোথায়?

জানি না কোথায়।

আব্দুল মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, ঘর খালি রেখে সব চলে গেছে কি আশ্চর্য ব্যাপার। যে তালা দিয়েছেন এটা তো আম্মা বাতাস লাগলে খুলে যাবে।

খুলে গেলে কি আর করা। ঘরে আছেই বা কি যে সিন্দুকের তালা লাগাতে হবে। অরু আছে কেমন?

আছে মোটামুটি।

মোটামুটি কেন?

আরেকটা সন্তান হবে এই জন্যেই শরীরটা একটু ইয়ে। ডাক্তার বলেছে। রক্তের অভাব। আয়রন ট্যাবলেট দিয়েছে। ঐ খাচ্ছে দিনে তিনটা করে।

তুমি ঢাকায় এসেছ কী জন্যে, কোনো কাজে না এমনি...

বিনা কাজে কী আর আম্মা আমার মত মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারে? ঢাকা-কুমিল্লা যেতে আসতেই পঞ্চাশ টাকা খরচা। কাজে এসেছি।

কাজটা কী?

জি বলব। একটু চা দিতে পারবেন? গত রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নাই, শরীরটা একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে। গোসল করব ভেবেছিলাম। বাথরুমে দেখি সাবান নাই...

কি আর করবে। সাবান ছাড়াই গোসল কর।

মিনু রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

ঘরে কিছু নেই। শুধু চা দিতে হল। তার জন্যে মিনু কোনো রকম সংকোচ বোধ করলেন না।

মতিন চায়ের কাঁপে চুমুক দিয়ে বলল, টাকাটার জন্যে আসলাম আম্মা। বিপদে পড়েছি। যার টাকা তাকে দিতে হয়। রোজ তাগাদা দিচ্ছে। মিনু বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের টাকা?

ঐ যে গত মাসে হীরু গিয়ে নিয়ে আসল।

হীরু টাকা নিয়ে এল? কিসের টাকা?

আকবার চোখ অপারেশনের টাকা। আমার হাতে তখন একেবারে খালি। তা অরু, এমন কান্নাকাটি শুরু করল। আমি কি আর করব ধার করে জোগাড় করলাম। এমনিতে তো কেউ টাকা দেয় না। সুন্দ কবুল করে ধার। তা ভাবলাম কী আর করা চোখ বলে কথা।

কত টাকা?

মতিন অবাক হয়ে বলল, কত টাকা। আপনি জানেন না? মিনু বিরক্ত গলায় বললেন, জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম? জানি না বলেই জিজ্ঞেস করছি। কত টাকা এনেছে?

দুই হাজার।

কী সর্বনাশ বল কী তুমি!

আপনি কিছুই জানেন না? এ তো দেখি আরেক মুসিবিত হয়ে গেল। হীরু মনে হচ্ছে ফাটকি মেরে টাকা নিয়ে এসেছে। এখন কী করি আমি?

হীরু আসুক হীরুকে বল। যাকে টাকা দিয়েছে তার ঘাড় ধরে টাকা আদায় কর। আমার কাছে কী?

আপনার কাছে কী মানে? এইসব আপনি কী বলছেন আম্মা?

সত্যি কথাই বলছি। হীরুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ তো বিরাট সমস্যায় পড়লাম। হীরুকে কী আমি টাকা দিয়েছি নাকি? টাকা দিলাম আপনাদের। রাত দশটার ট্রেনে ফিরব–এর মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করেন। পুরোটা না হলেও অন্তত হাজার খানিক। নয়ত বিরাট বেইজ্জত হব।

বললেই তো হবে না। টাকা পাব কোথায়? টাকা গাছ তো বাবা পুতা নাই। সংসারের হাল অবস্থা তো জান। জেনেশুনে এ রকম অবুঝের মত কথা বললে হবে নাকি?

আমি কী অবুঝের মত কথা বললাম? পুরো বেইজ্জত হব লোকের সামনে...

না হয় শ্বশুর বাড়ির জন্যে খানিকটা বেইজত হলেই।

আম্মা। আপনি ব্যাপারটাই বুঝতে পারছেন না।

মিনু ক্লান্ত গলায় বললেন, এ টাকার আশা তুমি ছেড়ে দাও বাবা।

আব্দুল মতিন চোখ কপালে তুলে ফেলল।

ছেড়ে দেব? কী বলছেন?

যা সত্যি তা বললাম।

আব্দুল মতিন খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে উঠে চলে গেল। কোথায় যাচ্ছে মিনু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যাক যেখানে ইচ্ছা। পুরোপুরি চলে গেলেই ভাল। তবে পরোপুরি চলে যায়নি। হ্যান্ড ব্যাগ ফেলে গেছে। হ্যান্ড ব্যাগের জন্য আসবে। সম্ভবত হীরুর খোঁজে গিয়েছে।

তিথি সন্ধ্যার একটু পরই বাড়ি ফিরে দেখে হুঁলস্থূল কাণ্ড। দুলাভাই এবং মা দুজনেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। কি নিয়ে কথা হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। তিথি বলল, এসব কী হচ্ছে দুলাভাই?

মতিন চোখ লাল করে বলল, কী হচ্ছে তুমি জানো না?

জি না।

বাজে কথা বলবে না। কি হচ্ছে তোমরা সবাই জান। এখন ভাল মানুষ সেজেছ। ভাইকে পাঠিয়ে টাকা আনবার সময় মনে ছিল না। এখন অস্বীকার যাচ্ছ।

কিছুই অস্বীকার যাচ্ছি না। আগে আপনি আমাকে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলুন। এরকম রাগ করছেন কেন?

মতিন পুরোপুরি গুছিয়েও বলতে পারল না। কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তবু মূল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। তিথি ক্লান্ত পলায় বলল, আপনার টাকা দিয়ে দেব। এক সঙ্গে

সবটা না পারলেও ভাগে ভাগে দেব। প্লিজ চিৎকার করবেন না। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে দুলাভাই?

মতিন কি-একটা বলতে সীল, বলতে পা েবল না। রাগে তার মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। সে হ্যান্ড ব্যাগ হাতে নিয়ে নিয়েছে। তিথি বলল, যাচ্ছেন কোথায় দুলাভাই?

মিনু বললেন, যেখানে ইচ্ছা যাক। তুই কথা বলিস না। ফজিলের ফাজিল।

মতিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে তীব্র গলায় বলল এর ফল ভাল হবে না। এর ফল। কিন্তু ভাল হবে না। তখন কিন্তু আমাকে দূষবেন না।

তিথি বলল, কাজটা কী ভাল কবলে মা? দুলাভাই গিযে আপার ওপর শোধ তুলবে।

তুললে তুলুক। মুখে অ্যাসিড মারুক! গালামা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিক যা ইচ্ছা করুক।

হয়েছে কী তোমার?

কিছু হয়নি।

বাবা কোথায় মা?

জানি না কোথায়। যাক যেখানে ইচ্ছা।

তিথি এক দৃষ্টিতে মাকে দেখছে। বোঝার চেষ্টা করছে। যতই দিন যাচ্ছে মা বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তন অতি দ্রুত হচ্ছে বলে খুব চোখে লাগছে।

তিথি লক্ষ্য করল মা শান্ত ভঙ্গিতে নিজের জন্য চা বানিয়ে জলচৌকিতে বসে খাচ্ছে। তব চেহারায় কোনো রকম বিকার নেই।

৭. পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা

জালালুদ্দিন হীরুর সঙ্গে তার পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পীর-ফকিরের প্রতি তার কোনো রকম বিশ্বাস নেই। তবু এসেছেন। কারণ ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যেহেতু চোখে দেখতে পান না হীরু হয়ত একটা রিকশা ভাড়া করবে। অন্ধ বাপকে তো আর হাঁটিয়ে নেবে না।

হীরু রিকশার ধার দিয়েও গেল না। ঠেলেঠলে এক বাসে তুলে ফেলল। সেই বাসে গাদাগাদি ভিড় এর মধ্যেও বসার জায়গা করে ফেলল। জানালার পাশে বসেছে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করল যাকে দেখে মনে হয় এর হৃদয়ে দয়ামায়া আছে, অনুরোধ করলে ফেলবে না। হীরু তার কাছে গিয়ে বিনয়ে প্রায় গলে গিয়ে বলল, ব্লাইণ্ড পারশন নিয়ে এসেছি ভাই জায়গা দিন। ব্লাইন্ড এবং সিক দুটাই একসঙ্গে। যায় যায় অবস্থা বলতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে জায়গা হল! হীরু বলল, থ্যাংকস ভাই। মেনি থ্যাংকস। হীরুর কাছে মনে হল আজকের দিনটা খারাপ না। শুভ। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। সব দিন দেখা হয় না! লোকজনের ভিড় থাকে। কোনো কোনো দিন পীর সাহেব চিল্লায় বসেন। চিল্লা ব্যাপারটা কী সে জানে না। তবে তার ধারণা ব্যাপারটা খুবই জটিল কিছু; কারণ পীর সাহেব যেদিন চিল্লায় বসেন সেদিন তার খাদেমরা ইশারায় কথা বলেন। তখন কোনো রকম শব্দ করা নিষিদ্ধ।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। যাওয়ামাত্র পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। যে কোনো কারণেই হোক আজ লোকজন একেবারেই নেই। পীর সাহেব বারান্দায় বিমর্ষমুখে একা একা বসে আছেন। অনেকটা দূরে দু'জন বোরকা পরা মেয়ে। মেয়ে দু'টি কাঁদছে। পীর সাহেব বললেন, খবর কি রে তোর?

হীরু বলল, আপনার দোয়া স্যার। আমি আমার ফাদারকে নিয়ে এসেছি। আপনার খুব ভক্ত।

পীর সাহেব নিস্পৃহ গলায় বললেন, ভাল করেছিস। খুব ভাল করেছিস।

ছোট ভাইয়ের ব্যাপারটাও স্যার একটু মনে করিয়ে দিতে আসলাম। খুবই চিন্তাযুক্ত আছি। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

পীর সাহেব বড় করে হাই তুললেন।

হীরু বাবার কানে কানে বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? পা ছুঁয়ে সালাম কর।

জালালুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন–পা দেখতেই পাচ্ছি না, সালাম করব কী?

হীরু পীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল বাবার চোখে একটা সমস্যা আছে স্যার। বলতে গেলে ব্লাইন্ড। একটু দয়া করে যদি দেখেন।

পীর সাহেব হীকর দিকে না তাকিয়েই বললেন, চোখ ঠিক হয়ে যাবে!

হীরু তার বাবার কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এক কথায় ঝামেলা মিটিয়ে দিলাম। এখন বাড়িতে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।

জালালুদ্দিন বিশেষ ভরসা পেলেন বলে মনে হল না; ফিসফিস করে বললেন, কাঁদছে কে রে?

হীরু বলল, মেয়েছেলে কাঁদছে। ওরা কাঁদবেই। মেয়েছেলে মানেই কান্দন পার্টি।

৮. যাদের সঙ্গে তিথির সময় কাটাতে হয়

যাদের সঙ্গে তিথির সময় কাটাতে হয় তাদের কারোর চেহারাই তার মনে থাকে না। যেন স্বপ্নদৃশ্য; ঘুম ভাঙলে স্বপ্নদৃশ্যের কাঠামো মনে থাকে, কিন্তু যাদের নিয়ে দৃশ্য তাদের চেহারা মনে থাকে না!

তিথি হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কার্ড বের করল; ইংরেজিতে লেখা কার্ড। তিনটা টেলিফোন নম্বর দেয়া। বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ নিশ্চয়ই। লোকটির চেহারা মনে পড়ছে না। লম্বা না বেঁটে, রোগা না মোটা কিছুই মনে নেই। তবে নার্ভাস ধরনের মানুষ ছিল এটা খুব মনে আছে। বারবার তার স্ত্রীর কথা বলছিল। স্ত্রীর নাম ফরিদা। বড় মেয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুলে সেভেনে পড়ে তাও মনে আছে, কিন্তু লোকটির চেহারা মনে নেই। কার্ডে লেখা মোঃ দবিরউদ্দিন বিএ (অনার্স)। কারখানার ঠিকানা এবং বাসার ঠিকানা দুটোই দেয়া আছে। তিথি ঠিক করল বাসাতেই যাবে। এই সময় ভদ্রলোককে বাসাতেই পাওয়া যাবে। নটা এখনো বাজেনি; এত ভোবে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কারখানায় চলে যাননি। তাছাড়া বাসায় যাধর অন্য একটা উদ্দেশ্য ও আছে। অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করা। বাসায় গিয়ে তিথি। যদি বলে, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন, তখন ভদ্রলোক হকচাকিয়ে যাবেন। চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিদেয করতে। তখন চাকরির প্রসঙ্গে ভদ্রলোক হয়ত বলবেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ব্যবস্তু! করছি। তুমি কাল আমার অফিসে এসো!

তুমি করে নাও বলতে পারে। হয়ত আপনি করে বলবে। না চেনার ভান ও করতে পারে। তবে এই লোক তা কববে না। এ নাভসি ধরনের ভীতু একজন লোক। নার্ভাস এবং ভীতু মানুষ চট করে মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলার সময়; সত্যি

কথাই বলে। সে ফে{ ভুল করে সত্যি কথা বলছে তা নিজে শুরুতে বুঝতে পারে না; যখন বুঝতে পারে তখন সে আবে: নার্ভাস হয়ে যায়। তিথি নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসল; কেন জানি তার খুব মজা লাগছে। যদিও মজা লাগার মত কিছু হয়নি।

বাসা খুজে পেতে দেরি হল না। দোতলা একটা বাড়ি। তিনতলার কাজ চলছে। বাড়ির সামনে ইট, সিমেন্ট, রিভ গাদাগাদি করে রাখা। ছসাত জন মিস্ত্রী কাজ করছে। চৌবাচ্চার মত একটা জায়গার চারপাশে গোল হয়ে বসে ইট পরিষ্কার করছে। ব্রাশ দিয়ে ইট ঘষে পানি ঢালছে। সেই ইট মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দোতলার ছাদে। তিথি বলল, এটা কী দাবির সাহেবের বাসা? ভূঁচালো দাড়ির এক মিস্ত্রী বিরক্ত মুখে বলল, জানি না। কার বাস। আফনে জিগান গিয়া। এই বলে সে নিচু গলায আরো কী যেন বলল। কোন কুৎসিত ইঙ্গিত কিংবা কোনো অশ্লীল রসিকতা। কারণ সঙ্গী সবাই শব্দ করে হেসে উঠল। দু'জন আড়চোখে তাকোল তিথির দিকে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক সমস্যা। কুৎসিত ইঙ্গিত রসিকতা সব সময় মেয়েদের নিয়েই করা হয়। পুরুষদের নিয়ে নয়।

তিথি ছুঁচালো দাড়ির মিস্ত্রীটের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, তুমি কী বললে? মিস্ত্রী এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। সে আমতা আমতা করতে লাগল। তিথি বলল, তোমার দাড়ি ধরে তোমাকে আমি এই পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরব বুঝতে পারছ?

মিস্ত্রীদের কেউ কোনো কথা বলল না। তারা ইট পরিষ্কারের ব্যাপারে এখন অতিরিক্ত মনোযোগী। ওদের একজন লজ্জিত গলায় বলল, কিছু মনে লাইয়েন না আফা। এইডা দবির স্যারের বাসা। ডাইন দিকে যান!

তিথি এগিয়ে যাচ্ছে। দাড়িওয়ালা মিস্ত্রীটি কী বলেছিল কে জানে। তার জানতে ইচ্ছা করছে। অনেক কিছুই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, শেষ পর্যন্ত জানতে পারি না। এটা একদিক দিয়ে ভাল। সবচে সুখী মানুষ তারাই যারা সবচে কম জানে। এটা তিথির বাবা জালালুদ্দিন সাহেবের কথা। জালালুদ্দিন সাহেব এক সময় দার্শনিকের কথাবার্তা বলতেন। এখন বলেন না। তার এখনকার সব কথা নিজের চোখ নিয়ে এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। আজও তিথি বেরুবার সময় অনেকক্ষণ বকবক করলেন।

একজন বড় চোখেন ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যা তো মা! বা চোখটায় এখন আর কিছুই দেখতে পাঠ না। আগে কিছুটা দেখতাম, হীরুর পীরের কাছে যাওয়ার পর থেকে এক্কেবারে সাড়ে সর্ব্বনাশ; এই দেখ, ডান চোখ বন্ধ কৰে তোব দিকে ত:কাচিহ্ন! তোকে দেখছি না। কিছু না অন্ধকার। ঐ শাল। পারের কাছে কেন যে গোলাম।

ডানটা কী ঠিক আছে?

এখনো আছে আর কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। একটা গেলে অন্যটা যায় এটাই নিয়ম। তিথি অন্যমনস্ক স্বাবে বলল তুমি দেখি অনেক নিয়ম-কানুন জান। তার উত্তরে জালালুদ্দিন কিছু বলেননি। অদ্ভুত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়েছেন। তিথি বলেছে সামনের সপ্তাহে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

দেরি হয়ে যাবে তো।

দেরি হলেও কিছু করার নেই। হাত খালি। ডাক্তার বিনা পয়সায় তোমাকে দেখবে না। নগদ একশ টাকা দিতে হবে। জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, আমার কাছে কিছু আছে।

তিথিবি জন্যে এই খবরটা অবাক হবার মত। রান্না হয়নি, খাওয়া-দাওয়া হয়নি এমন দিন ও তাদের গেছে। জালালুদ্দিন শব্দ করেননি; শুকনে মুখে উপোস দিয়েছেন। অথচ তার কাছে টাকা ছিল। তিথি বলল,

কত টাকা আছে?

তিনি জবাব দেননি; চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; একটা হাত একবার ডান চোখের সামনে ধরছেন, একবার বাঁ চোখের সামনে। তিথি বলল, কত টাকা বল? আমি তো নিয়ে যাচ্ছি না।

আছে কিছু।

সেই কিছুটা কত?

এই ধরা শ পাঁচেক।

এতগুলি টাকা নিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলে? তুমি তো বেশ মজার মানুষ বাবা। দাও আমাকে একশ টাকা ধার দাও। ভয় নেই, ফিরিযে দেব। তিনি না-শোনার ভান করলেন। খাট থেকে নেমে হাতড়ে হাতড়ে রওনা হলেন বাথরুমের দিকে। তিথি বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেরুলেন না।

তের–চৌদ্দ বছরের রোগা একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মেয়েটির চেহারা খুব মায়াকাড়া! ভারি কোমল চোখ! গোলাকার মুখ! যেন কেউ কাটা কম্পাস দিয়ে মুখ একেছে। পাতলা ঠোঁট। এত পাতলা যে মনে হয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকালে রক্ত চলাচল দেখা যাবে।

দবির সাহেবের বাসা?

জি।

উনি আছেন?

জি গোসল করছেন।

কে হন তোমার?

আমার বাবা।

আমি উনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বসুন। বাবা বের হলে বলব। উনার বের হতে অনেক দেরি হয়।

তোমার নাম কী?

অজন্তা।

বাহ খুব সুন্দর নাম তো।

আমার ভাল নামটা খুব খারাপ।

ভাল নাম কী?

অজন্তা কিছু বলল না। আগ্রহ নিয়ে সে তিথিকে দেখছে। মনে মনে বলছে, এই মেয়েটার গলার স্বর এত মিষ্টি কেন? শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। তার একটু মন খারাপও হল। অজন্তার ধারণা তার গলার স্বরটা খুব বাজে। কর্কশ, কানে লাগে। এই জন্যে বাইরের মানুষের সামনে সে কথার্বতা একেবারেই বলে না। তবু এই মহিলাটির সঙ্গে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। এখন মন খারাপ লাগছে। তার ধারণা এই মহিলা মনে মনে বলছেন। অজন্তা মেয়েটা এত সুন্দব কিন্তু তার গলার স্বর এরকম কাকের মত কেন? তিথি বলল,

তোমার আজ স্কুল নেই অজন্তা?

উঁহু।

কিসের ছুটি?

এসএসসি পরীক্ষার ছুটি। আমাদের স্কুলে সিট পড়েছে।

তুমি ক্লাস সেভেনে পড়, তাই না?

অজন্তা অবাক হয়ে বলল, কি করে বুঝলেন? তিথি হাসিমুখে বলল, চেহারা দেখে আমি অনেক কিছু বলতে পারি। এখন দেখ তোমার বাবা বের হয়েছেন কী না।

বের হননি।

কী করে বুঝলে?

বাথরুমের দরজা খুলেই তিনি আমাকে ডাকেন লেবুর শরবত দেবার জন্যে। গোসল শেষ করে তিনি এক গ্লাস লেবুর শরবত খান। ভিটামিন সি আছ শরবতে। বেশি করে ভিটামিন সি খেলে মাথায় চুল ওঠে।

তিথি হেসে ফেলল। অজন্তা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। নিজের ওপর তার খুব রাগ লাগছে। কাকের মত গলায় সে এতক্ষণ ধরে কথা বলেছে। কী লজ্জা! জিভটা কেটে ফেলতে পারলে বেশ হত। ভেতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল, অজু, মা অজু। অজন্তা মুখ কালো করে বলল, বাবা আমাদের আদর করে অজু ডাকেন। কী বিশ্রী যে লাগে শুনতে। দবির সাহেব খালি গায়ে, কাধে শুধু একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে বসার ঘরে ঢুকেই পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেলেন। তিথি উঠে দাঁড়াল। তিনি ভাঙা গলায় বললেন বস। বস। তিথি বলল, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন...

হুঁ।

আমার নাম মনে আছে আপনার?

না, নাম মনে নাই। আমার কোনো মানুষের নাম মনে থাকে না। চেহারা মনে থাকে; একবাধ কাউকে দেখলে সারা জীবন মনে থাকে। তুমি ব্যস, আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসি।

আমি কী আপনাকে কোনো অস্বস্তিতে ফেলেছি।

হুঁ, তা তা তা কিছুটা... কী জন্যে এসেছ?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

আমি, আমি আসতে বলেছিলাম? বল কী!

একটা কার্ড দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ঠিকানা পেলাম।

ও আচ্ছা আছচা।

বলেছিলেন। আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন।

চাকরি? চাকরি আমি কোথায় পাব?

তা তো জানি না; আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, তাই এসেছি। চলে যেতে বললে চলে যাব।

না না বস। একটু বাস। চা খাও! আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসছি। ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। চারজন ছিল। গত সোমবার একসঙ্গে চারজনকে বরখাস্ত করেছি। ছাব্বিশ ইঞ্চি একটা কালার টিভি চুরি হয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া সেটা সম্ভব না। আমার ধারণা, ওরা ধরাধরি করে টিভিটা চোরের রিকশায় তুলে দিয়ে এসেছে। আই অ্যাম পজিটিভ।

দবির উদ্দিন শার্ট গায়ে দেবার জন্যে দোতলায় চলে গেলেন। তার ঘর তার স্ত্রী ফরিদার ঘরের পাশে। এক সময় তারা দু'জন এক খাটে ঘুমুতেন। এখন তা সম্ভব না। ফরিদার গায়ে একটু হাত রাখলে সে ব্যথায় নীল হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে তার পিঠে দগদগে ঘা হয়েছে। সেখান থেকে কটু গন্ধ আসে। দবির উদ্দিন সেই গান্ধ সহ্য করতে পারে না। সমস্ত শরীর পাক দিয়ে ওঠে। মনে হয় বমি করে ফেলবেন। বহু কষ্টে বমির চাপ সামলাতে হয়। সামলাতে না পারলে খুব খারাপ ব্যাপার হবে। ফরিদা মনের কষ্টেই মরে যাবে।

দবির উদ্দিন ফরিদার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালেন। সকাল বেলার এই সময়টায় সে আচ্ছান্ন অবস্থার মধ্যে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা বলে না। তাকায় না পর্যন্ত। কথা বলতে শুরু করে বিকেলের দিকে। আজি অন্য রকম হল। ফরিদা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন এই শোন। দবির উদ্দিন ঘরে ঢুকলেন। দরজার ও-পাশ থেকে বললেন কী?

ঐ মেয়েটা কে?

কোন মেয়েটা?

ফরিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে। দবির উদ্দিন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। ফরিদা বললেন, মেয়েটাকে আমার এখানে একটু আসতে বল। আমি কথা বলব!

তিথি অনেকক্ষণ কিছু দেখতেই পেল না। জানালা ভারী পর্দায় ঢাকা। ঘরের তিনটি দরজার দুটোই বন্ধ। যেটা খোলা, সেখানেও জানালার মতই ভারী পর্দা। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার আগেই তিথি শুনল কেউ একজন তীক্ষ্ণ গলায় বলছে, ভেতরে এসে দাঁড়াও। পর্দা ধরে দাড়িও না। পর্দার কাঠ আলগা হয়ে আছে, মাথার উপর পড়বে।

তিথি খানিকটা এগুলো। এগুতে ও ভয় লাগছে। কোনো কিছুর সঙ্গে হয়ত ধাক্কা লাগবে।

তোমার বা দিকে চেয়ার আছে, তুমি চেয়ারে বাস।

সে বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে। ঘর দেখা যাচ্ছে। পুরনো আমলের পালংক দেখা যাচ্ছে। পালংকে শুয়ে থাকা মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। খুব রুগ্ন মানুষকে আমরা কংকাল বলি। এই মহিলাটি তাও নয়। তার কংকাল ও যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। হাঁটু পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মাথার উপর শ্লথগতিতে একটা ফ্যান ঘুরছে। ঘরের ভেতর চাপা এক ধরনের গন্ধ।

বসতে বললাম, বসছ না কেন?

তিথি বসল। তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ফরিদা বললেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে বাস; তোমার মুখ দেখতে পারছি না। তিথি চেয়ার ঘুরিয়ে বসল।

তোমার চেহারা তো বেশ সুন্দর। বেশ্যাদের এত সুন্দর চেহারা থাকে জানতাম না। আমি শুনেছি। ওদের শরীর ভাল থাকে, চেহারা ভাল থাকে না। তিথি তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

তোমাকে বেশ্যা বলায় রাগ করলে নাকি? ও আমাকে তোমার বিষয়ে বলেছে। ও আমাকে সব কিছু বলে। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না।

আপনি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী।

ঠাট্টা করলে নাকি?

তিথি কিছু বলল না।

ফরিদা বললেন, আমি অবশি। শুনেছি তোমার মত মেয়েরা খুব ঠাট্টাতামাশা করতে পারে।

আমাদের সম্পর্কে এত খবর জানলেন কী ভাবে?

ইচ্ছা করলেই জানা যায়। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে। জেনেছি।

তিথি বলল, আপনার কথা কী শেষ হয়েছে। আমি এখন উঠব?

না বস। আরো খানিকক্ষণ বস। তোমার কাজের ক্ষতি হলেও বাস, আমি পুষিয়ে দেব।

কীভাবে পুষিয়ে দেবেন? ঘণ্টা হিসেবে টাকা দেবেন?

হ্যাঁ দেব। তুমি বস। চা খেয়েছ তুমি? চা দিয়েছে?

না দেয়নি। চা খেলে আপনার কাপ নোংরা হয়ে যাবে না?

হবে। আমার এত শুচিবায়ু নেই। আচ্ছা তুমি বল ও তোমার সঙ্গে কী কী করেছিল?

আপনার স্বামী আমার সঙ্গে কী কী করেছিল তা শুনতে চান?

হুঁ।

উনি আপনাকে কিছু বলেননি?

বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তুমি বল। আমি তোমাকে টাকা দেব। এটা বলার জন্যে আপনি আমাকে টাকা দেবেন?

হ্যাঁ দেব। ও ভীষণ লাজুক। ওর মত লাজুক একটা মানুষ তোমার মত সুন্দরী একটা মানুষ নিয়ে কী করল তাই জানতে চাই।

আপনিও তো এক সময় সুন্দরী ছিলেন। আপনাকে নিয়ে উনি কী কী করেছিলেন?

আমি আর তুমি এক হলাম?

এক না? আমাদের দুজনের শরীরই তো এক রকম? তাই নয় কী?

তুমি খুবই ফাজিল একটা মেয়ে।

আমার মত মেয়েরা ফাজিলও হয়। এই খবরটা বোধ হয় আপনি জানেন না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমরা খুব ফাজলামী করি আবার ছেলেদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার। এখান থেকে যাবার সময় আমি করব কী জানেন? আপনার মুখে থুথু দিয়ে যাব। আপনার শরীরের যে অবস্থা আপনি আমার সেই থুথু মুখে মেখে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারবেন না।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ফরিদা এই কথায় রাগ করলেন না, বরং তার মুখের রেখাগুলি কোমল হয়ে গেল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, তোমার নাম কী?

আমার দশটা নাম আছে। কোনটা আপনাকে বলব?

সত্যি নামটা বল।

সত্যি নাম আমার নেই। আমার সবই নকল নাম।

তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ। আমি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ; আর অল্প কিছু দিন বেঁচে আছি! এরকম একজন মানুষের ওপর রাগ করা ঠিক না।

আপনার মত রোগীরা সহজে মরে না। আপনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের হাড় ভাজা ভাজা করবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষ এক'দিন মনে মনে আপনার মৃত্যু কামনা করবে...তবু আপনি মরবেন না।

ফরিদা বললেন, তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তুমি আমার আরো কাছে আসি তো তোমাকে ভাল করে দেখি। জানালার একটা পর্দাও সরিয়ে দাও; ঘর বেশি অন্ধকার হয়ে আছে। আজ এত অন্ধকার কেন বল তো? ঝড়বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশে কী মেঘ আছে?

তিথি একটি প্রশ্নের জবাবও দিল না। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, যাই।

ফরিদা বললেন, থুথু দিয়ে গেলে না?

তিথি তার জবাব না দিয়ে নিচে নেমে গেল। দবির উদ্দিন বারান্দায় মেয়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। তিথি তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে উঠোনে নামল। দাবিব উদ্দিন শংকিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। অজন্তা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটা কে বাবা? দবিব উদ্দিন মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছু একটা বলতে গেলেন, গলা দিয়ে শব্দ বের হল না। গলার মধ্যে আটকে গেল।

৯. টুকু বুঝতেই পারল না

টুকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে। অন্ধকার এবং অপরিচিত একটা ঘর। সে শুয়ে আছে মেঝেতে। তার গায়ে দুর্গন্ধ মোটা একটা কাঁথা। সে শুনল ইনিয়ে-বিনিয়ে অল্প বয়েসী। একটা বাচ্চা কাঁদছে। কান্নাব শব্দ শুনতে শুনতে টুকু চোখ বন্ধ করল। এই মুহূর্তে সে কিছু ভাবতে চায় না! ঘুমুতে চায়। আরামে তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। ঘুম এত আরামের হয় সে আগে কখনো ভাবেনি। এখানে সে কী ভাবে এল? নিজে নিজে নিশ্চয়ই আসেনি। কেউ এসে দিয়ে গেছে। কতদিন আগে দিয়ে গেছে? এক'দিন দু'দিন না। সাত দিন? বাড়ি থেকে যেদিন সে বের হল সেদিন কী বার ছিল? সোমবার না মঙ্গলবার? এটা কোন কাল? শীত না গ্রীষ্ম? কিছুই মনে পড়ছে না।

গায়ের উপর রাখা মোটা কথা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ঘুমের মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আরো যেন বেশি পাওয়া যাচ্ছে। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। বমি বমি লাগছে।

টুকু দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। সঙ্গে সঙ্গে মোটা একটা গলা শোনা গেল নাম কী তোর? এই নাম কী রে?

টুকু জবাব দিল না; জবাব দেবার আগে লোকটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটা বসেছে এমনভাবে যে তাকে দেখতে হলে মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে হয়। মাথা ঘুরাতে ইচ্ছা করছে না।

এই পোলা, এই! কিছু খাবি? খাবি? কথা কস না ক্যান? বোলা নাহি। এই এই।

টুকু কথা না বলাই ভাল বিবেচনা করল। কথা বলতে শুরু করলেই এরা অসংখ্য প্রশ্ন করবে। বাড়ি কোথায়? বাবার নাম কী? থাক কোথায়? পড়াশোনা করি? কী হয়েছে তোমার?

এরচে এই যে চুপচাপ পড়ে আছে এটা কী ভাল না? টুকু আগ্রহ করে আশপাশের জীবনযাত্রা দেখছে। যে লোকটি তার সঙ্গে কথা বলছে তার চেহারা সে এখনো দেখেনি। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুড়ো কেউ হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব কাশছে।

এই পোলা, ভুখ লাগছে? কিছু খাবি? ও মতির মা, এই পুলারে খাওন দেও!

মতির মা ঘরে ঢুকল। হাতে এলুমিনিয়ামের বাটি এবং চামচ। বাটিতে তরল সবুজ রঙের কি একটা জিনিস। মতির মার পরনে গাঢ় সবুজ রঙের একটা শাড়ি। বয়স ও খুব কম। একে দেখে মনে হয় না মতি বলে তার কোনো ছেলে আছে।

মাতিব মা, এই পুলাব জবান বন্ধ। তার মুখে তুইলা চাইরাে◌ডা খাওয়াইয়া দাও।

মতির মা চামচে করে সবুজ রঙের ঐ জিনিস টুকুর মুখের কাছে ধরল। মতির মার মুখ ভাবলেশহীন। এই ছেলে কিছু খাক না খাক তাতে তার কিছু যায় আসে না। টুকু আগ্রহ করে খেল। জিনিসটা খেতে ভাল। টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। মাতিব মা যতবার চামচটা মুখের কাছে ধরছে। ততবারই তার হাতেব চুড়ি টুনটুন কবে বাজছে। মেয়েটির হাত ভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়ের সাদি হাত ভর্তি লাল চুড়ি থাকে তাহলে দেখতে অনা রকম লাগে।

বুড়ো কাশতে কাশতে ডাকল, ও মতির মা।

কী?

এই পুলার তো জবান বন্ধ। তারে ঘবে আইন্যা তে! দেহি আরেক বিপদে পড়লাম।

ফালাইয়া দিয়া আহ।

পুলার গাযে জ্বর আছে কি-না দেহ দেহি।

মতির মা টুকুর গায়ে হাত না দিয়েই বলল, জ্বর নাই।

আর একটা দিন দেখি তারপরে যেখান থাইক্যা আনছি হেইখানে ফালাইয়া থুইয়া আসমু।

যা ইচ্ছা কর।

টুকু আগ্রহ করে চারদিকে লক্ষ্য করছে। এটা নিশ্চয়ই বস্তির কোনো-একটা ঘর। চৌকিটৌকির কোনো ব্যবহার নেই। ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত চাটাই বিছানো। যখন যার ইচ্ছা! এসে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে যাচ্ছে। রান্না এবং খাওয়াব ব্যবস্থা বারান্দায। বিরাট একটা হাড়িতে কি যেন রান্না হয়েছে। বাড়ির লোকজন নিজের নিজের ইচ্ছামত খেয়ে চলে যাচ্ছে। এই পরিবারের লোক কজন টুকু ধরতে চেষ্টা করল। পারল না। মনে হচ্ছে অনেকগুলি মানুষ। এতগুলি মানুষের মেঝেতে ঘুমুবার জায়গা হয় কী করে জানে? এর

মধ্যে একটি মেয়ের মনে হয় নতুন বিয়ে হয়েছে। সবাই তাকে নয়া বৌ নয়া বৌ বলছে। মেয়েটা বেশ সেজোগুজে আছে।

বিকেলের দিকে টুকু উঠে বসল। ঘোর বর্ষ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। এই ঘরে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ছে না।–এই আনন্দেই বাড়ির মানুষগুলি উল্লসিত; আধরুড়ো একটা লোক বারবার বলছে . পলিথিনেধ কাগজ দিয়ে কেমুন মেরামত করালাম দেখছ? পঁচিশ টাকা খরচ হইছে কিন্তু আরাম হইছে কত টেকার? পঁচিশ হাজার টেকার আরাম।

নয়া বৌ এই কথায় খিলখিল করে হাসল। বুড়ো টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, শইলডা এখন কেমন লাগে?

টুকু কিছু বলল না। ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল।

পেশাব-পায়খানা করবি নাকি? এই পুলা?

টুকু তাকিয়ে রইল। চোখের পলক ফেলল না।

বুড়ো দুঃখিত মুখে বলল, আহা জবানডা বন্ধ। ঐ পুলা থাক শুইয়া থাক।

টুকু সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। কে তাকে এখানে এনেছে তা জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। কেউ তাকে কিছু বলছেও না। জবান বন্ধ অবস্থায় থাকার খুব মজা আছে।

নয়া বৌ-এর স্বামী শ্যামলী সিনেমা হলের গেট ম্যান। সে বাড়ি ফিরল রাত বারটায়। টুকুকে দেখে বলল, হারামজাদা এখনো আছে?

বুড়ো বলল, গাইলমন্দ করিস না। এই পুলার জবান বন্ধ। গুংগা পুলা। লোকটি বাড়ি ঢুকেই শাড়ি টানিয়ে ঘরের কোণায় পর্দা ঘেরা একটা জায়গা তৈরি করে ফেলল। এই ঘরের ছোট কটা বাচ্চা ছাড়া সবাই প্রায় জেগে আছে। সে এই সব অগ্রাহ্য করে পর্দা ঘেরা জায়গায় চলে গেল।

পর্দার ভেতরে একটা কুপি জ্বলছে বলে এদের দুজনের কালো ছবি পর্দায় পড়ছে। এরা কি করছে না করছে সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে টুকুও খুব আগ্রহ নিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার এত অদ্ভুত লাগছে।

পুরো ব্যাপারটা অবশ্যি দেখা গেল না। বুড়ো বিরক্ত গলায় বলল, ঐ হারামজাদা পুলা। বাতি নিভা। তাড়াতাড়ি বাতি নিভা।

বাতি নিভে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। অপূর্ব ছায়াছবির শেষটা দেখা গেল না বলে টুকুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সারা রাত বৃষ্টি হল। তুমুল বৃষ্টি। ঘরের দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। তাতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। টুকুর ঘুম আসছে না। তার চমৎকার লাগছে। মজার মজার সব চিন্তা মাথায আসছে। সেই সব চিন্তার একটা হচ্ছে এটা যেন বস্তিব কোনো ঘর না। এটা হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজ। ঝড়ে এই জাহাজের কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেছে, জাহাজ ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশেব পথে। জাহাজের যাত্রীরা সবাই মরণাপন্ন; কারণ জাহাজে খাদ্য নেই, পানি নেই; জাহাজের তলানীতে একটা ফুটো হয়েছে। সেই

ফুটো দিয়ে কলকল করে পানি আসছে; ফুটো বন্ধ করার চেষ্টা করে ও লাভ হয়নি। এখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। দুলতে দুলতে জাহাজ এগুচ্ছে।

টুকু সত্যি সত্যি এক ধরনের দুলুনি অনুভব করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আকাশ খানিকটা আলো হয়েছে। মেঘ নেই। বৃষ্টি ভেজা টাটকা একটা দিন। টুকু সাবধানে ঘুমন্ত মানুষদের ডিঙিয়ে ঘর থেকে বেকল। হাঁটা শুরু করল। একবার ও পেছনে ফিরে তাকাল না।

একটা সময় আছে যখন আমাদের পেছন ফিরতে ইচ্ছা করে না।

১০. পীর সাহেব বলেছিলেন

পীর সাহেব বলেছিলেন টুকু সাতদিনের মাথায় ফিরে আসবে। কিন্তু সত্যিই যে সাতদিনের মাথায় টুকু এসে উপস্থিত হবে এই বিশ্বাস হীরুর ছিল না। কাজেই ভোর বেলা দরজা খুলে টুকুকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। মনে মনে দুবার বলল, এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব! এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব।

মুখে সে অবশ্যি রাগ এবং বিরক্তির ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, টুকু নাকি? একি চেহারা হয়েছে। তুই তো দেখি কংকাল হয়ে গেছিস; স্কেলিটন। শরীরে তো হাড়িড ছাড়া কিছু দেখছি না। ছিলি কোথায়?

টুকু জবাব দিল না। কথা না-বলা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

হীরু বলল, বাসার সবাই একটা গ্রেট চিন্তার মধ্যে ছিল; আমি অবশ্যি চিন্তা করছিলাম না। পীর সাহেব চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলেন। কলতা বাজারের পার। তোকে এক'দিন নিয়ে যাব। হেভি পাওয়ার লোকটার। আমার ধারণা শ খানেক জ্বীন তার হাতে আছে। বেশিও হতে পারে।

টুকুকে ফিরতে দেখে বাসার কেউ কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। মিনু একটি কথাও বললেন না।

সকালে খিচুড়ি নাশতা হল। সেই খিচুড়ির এক থালা টুকুর সামনে রেখে তিনি কঠিন গলায় বললেন খা। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। টুকুর সঙ্গে এই হল তার প্রথম কথা।

তিথি ভাইকে দেখল। কিন্তু কিছু বলল না, হাসল। সেই হাসি চিন্তা দূর হবার হাসি। যা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় টুকু ফিরে আসায্য সে খুশি হয়েছে।

জালালুদ্দিন রাগী গলায় খানিক ক্ষণ বকাঝকা করলেন; বকাঝকার ফাকে ফাকে উপদেশ দিলেন বাড়ি পালানো হচ্ছে একটা অসুখ। সরল অসুখের চিকিৎসা আছে কিন্তু বাড়ি পালানো অসুখ এবং ক্যানসার এই দুয়ের কোনো চিকিৎসা নেই। একবার যার বাড়ি পালানো রোগ হয়েছে সে দু'দিন পর পর পালাবে। এটা জানা কথা।

তিনি বেশিক্ষণ উপদেশ দিতে পারলেন না। তার প্লেটের খিচুড়ি শেষ হয়ে গেছে। শূন্য থালা সামনে নিয়ে কথা বলতে তার ভাল লাগে না। তিনি নিচু গলায় বললেন, ও মিনু খিচুড়িটা তো আসাধারণ হয়েছে। আতপ চাল ছিল তাই না? আতপ চাল ছাড়া এই জিনিস হয় না। আছে নাকি আরো?

মিনু বললেন না। এক হাতা দাও দেখি। মুখের ক্ষিধেটা যাচ্ছে না। পেট অবশ্যি ভর্তি। তবু মুখের ক্ষিধের ব্যাপার আছে

বললাম তো নাই।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে। না থাকলে কী আর করা। আজ দুপুরেও খিচুড়ি করলে কেমন হয়? আতপ চাল কী আরো আছে?

চুপ কর তো। খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়া ছাড়াও তো আরো জিনিস আছে।

সেই জিনিসটা কী?

চুপ কর।

জালালুদ্দিন চুপ করতে পারলেন না। টুকুকে আবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন বুঝলি টুকু, ঘর হচ্ছে মানুষের মা। শিশু থাকে মায়ের পেটের ভেতর। আমরা থাকি ঘরের পেটের ভেতর। সেই জন্যে ঘর হচ্ছে আমাদের মা! ঘর থেকে পালান মাকে অপমান করা। এই কাজ খবরদার করবি না। মায়ের পেট থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর মায়ের পেটে ঢুকতে পারে না। তেমনি ঘর থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর ঘরে ঢুকতে পারে না। বুঝলি?

টুকু মাথা নাড়ল। যেন সে এই জটিল ফিলসফি বুঝে ফেলেছে। তার মাথা নাড়া জালালুদ্দিন দেখতে পেলেন না। তবে টুকু যখন নিজের থালার খিচুড়ি বাবার থালায় ঢেলে দিল তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। চিকন গলায় বললেন, তুই খাবি না?

না।

না কেন? জিনিসটা তো ভাল হয়েছে।

ক্ষিধে নেই।

এইটুকু খিচুড়ি খেতে ক্ষিধে লাগে নাকি? এ তো দেখি পাগলের প্রলাপ।। ও মিনু একটা শুকনো মরিচ পুড়িয়ে এনে দাও তো।

টুকু বসে বসে বাবার খাওয়া দেখল। তার বড় ভাল লাগল। দুপুরে গেল বজলু ভাইয়ের খোঁজে।

বজলু তাকে দেকে আঁৎকে উঠে বলল, কী সর্বনাশ তোর একি অবস্থা! কোথায় ছিলি? টুকু সহজ গলায় বলল, এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বেড়াতে যাবি, বলে যাবি না? তোর বড় ভাইকে এক'দিন জিজ্ঞেস করলাম–টুকু কোথায়? সে বলল, আমি কী করে বলব কোথায়? আমি কী ডিটেকটিভ? কী কথার কী উত্তর। তা তোর স্বাস্থ্যের এই অবস্থা কেন?

জ্বর হয়েছিল।

কাজের সময় জ্বরজারি বঁধিয়ে দিস, আশ্চর্য। তোর জন্যে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা বের হল না। শিল্প-সাহিত্য এইসব তো ছেলেখেলা না। এক'দিন করবি দশদিন করবি না তা তো হবে না। কমিটমেন্ট দরকার।

দুপুর থেকেই টুকু কাজে লেগে গেল। এবারে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা নতুন আঙ্গিকে বেরুচ্ছে। পুরো দেয়াল পত্রিকা পলিথিনের কাগজে মুড়ে বৃষ্টির মধ্যে রেখে দেয়া হবে। শ্রাবণ ংখ্যা পড়তে হলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পড়তে হবে। এই অসাধারণ আইডিয়া বজলুর মাথাতে এসেছে। এরকম আইডিয়া তার প্রায়ই আসে।

সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত টুকু দেয়াল পত্রিকার কাজ করল। সন্ধ্যা মেলাবার পরপর কাউকে কিছু না বলে চলে গেল বস্তির ঐ ঘরে।

বুড়ো লোকটি বারান্দায় বসে কাঠের চেয়ারে বেতের কাজ করছিল সে টুকুকে দেখে গলা ফাটিয়ে চোঁচাতে লাগল–ও মতির মা, ও মতির মা! ঐ পুলা আবার আসছে। জবান বন্ধ পুল। ঐ হারামজাদা তুই কৈ গেছিলি? আমরা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির! ঐ পুলা দেহি এদিকে আয়।

শুধু মতির মা না, ঘরের সবাই বের হয়ে এল। টুকু এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মতির মা বলল, নয়া বৌ এই পুলাডার খাওন দাও। এ না খাইয়া সারাদিন কই কই যেন ঘুরছে।

নতুন বৌ তৎক্ষণাৎ ভাত বেড়ে ফেলল। ভাত এবং ডাটা দিয়ে রান্না করা ছোট মাছের তরকারি। তরকারিতে এমন ঝাল দেয়া হয়েছে যে মুখে দিলেই চোখে পানি এসে যায়। টুকু সেই আগুন ঝাল তরকারি তৃপ্তি করে খেল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। তার ঘুমের জন্যে জায়গাও করে দেয়া হয়েছে। তবে সে ঘুমুচ্ছে না, অনেক কষ্টে জেগে আছে। তার এখানে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে–শাড়ি দিয়ে ঘেরা অংশে নতুন বৌ এবং তার স্বামীর অভিনীত অংশটা দেখা। টুকু মনে মনে আশা করছে আজো যেন কুপী নিভাতে ওরা ভুলে যায়।

১১. মনটা খুবই ব্যাড হয়ে আছে

হীরু বলল, মনটা খুবই ব্যাড হয়ে আছে।

এ্যানা হেসে ফেলল।

হীরু রাগী গলায় বলল, হাসলে কেন?

আপনি বললেন মনটা খুব ব্যাড হয়ে আছে–এই শুনে হাসলাম। বললেই হয় মনটা খারাপ হয়ে আছে।

হীরু গম্ভীর হয়ে গেল। এই মেয়ে ইদানীং উল্টাপাল্টা কথা বলে তাকে কষ্ট দিচ্ছে। অবশ্যি এটাই মেয়েদের নেচার। কোনো না কোনো ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়া।

ওরা দুজনে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের দেখা হয়ে গেছে কাকতালীয় ভাবে। হীরু যাচিছিল পীর সাহেবের কাছে। বাস সটপে এসে দেখে এানা। চার-পাঁচদিন চেষ্টা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। পরশু দিন তো প্রায় গোটা দিন এ্যানাদের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে কাটাল। লাভ হল না।

আর আজ কি-না দেখা হয়ে গেল বাস স্টপে। একি যোগাযোগ। সে মধুর স্বরে বলল, যাচ্ছ কোথায় এ্যানা?

যাত্রাবাড়িতে। আমার ছোট চাচার বাড়িতে।

যাত্রাবাড়িতে যাচ্ছ? বলা কী! আমিও তো ঐ দিকে যাচ্ছি। আমার এক ফ্রেন্ডের বাসা। ক্লোজ ফ্রেন্ড। জন্ডিস হয়ে পড়ে আছে। খবর পাঠিয়েছে যাবার জন্যে। মেইন রোডে বাসা।

এ্যানা হোসে ফেলল।

হীরু বলল, হাসলে কেন?

আপনি যে সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলেন এই জন্যে হাসলাম।

কী মিথ্যা বললাম?

যাত্রাবাড়িতে বন্ধুর কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরো মিথ্যা। আমি যদি বলতাম, আমি বাসাবো যাচ্ছি, তাহলে আপনি বলতেন। আপনিও বাসাবো যাবেন। আপনার এক বন্ধু আছে বাসাবোতে। তার জন্ডিস। এখন-তখন অবস্থা।

হীরু এ্যানার বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটু মন খায়াপও হল। এরকম একটা বুদ্ধিমতী মেয়েকে বিয়ে করে শেষে কোন যন্ত্রণা হয় কে জানে। বিয়ে না করেও তো উপায় নেই। প্রেম যখন

হয়ে গেছে।

বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড়।

পরপর দু'টা বাস মিস হল–চেষ্টা করেও তারা উঠতে পারল না। হীরুর খুব ইচ্ছা একটা রিকশা নিয়ে দুজনে চলে যায়। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তার ওপর আছে এ্যানার গা ঘেঁষে বসার আনন্দ। সমস্যা হচ্ছে তার কাছে আছে মাত্র দশটা টাকা। সত্তর টাকা ছিল। পীর সাহেবের জন্যে এক প্যাকেট বেন্যসব কিনতে গিয়ে ষাট টাকা বের হয়ে গেল। অবশ্যি কোনো-একটা দোকানে বেনসনের প্যাকেট বেচে দেয়া যায়। চল্লিশ টাকা বললে ওরা লুফে নেবে।

এ্যানা।

কী।

চল একটা রিকশা নিয়ে নেই। এক দানে যাওয়া যাবে না। ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। এখান থেকে নিউ মার্কেট। নিউ মাকেট থেকে গুলিস্তান–তারপর গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ি।

হীরুকে অবাক করে দিয়ে এ্যানা বলল, রিকশা নিয়ে নিন।

সত্যি বলছি? ট্রথ?

হুঁ, সত্যি।

রিকশা নেবার আগে হীরু বেনসনের প্যাকেট বিক্রি করল পঁয়তাল্লিশ টাকায়। তার মনে একটু খচখচানি রইল পীর সাহেবের জনো কেনা জিনিস বিক্রি করা ঠিক হল না।

রিকশায় উঠে সেই খচখচানি দূর হয়ে গেল। এত ভাল লাগল এ্যানাকে পাশে নিয়ে বসতে। এ্যানা একটা হাত রেখেছে হীরুর ডান পায়ের উপরে। একটা মেয়ে তার হাত রেখেছে হীরুর হাঁটুতে এতেই এত আনন্দ হচ্ছে কেন? হীরুর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। হীরু বলল, মনটা খুব খারাপ এ্যানা। খুবই খারাপ।

কেন?

টুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

টুকু আবার কে?

আমার ইয়ংগার ব্রাদার।

সে তো অনেক আগেই গেছে।

এসেছিল। সকালে এসে সারাদিন থাকল সন্ধ্যানেল আবার গান।

কোথায় গেছে?

জানি না কোথায়। পীর সাহেবের কাছে যাব। দেখি উনি কী বলেন।

কিছু-একটা হলেই আপনি পীর সাহেবের কাছে চলে যান, তাই না?

সাংঘাতিক পাওয়ার উনার। তোমাকে এক'দিন নিয়ে যাব।

পীর সাহেবের কাছে যাবার আমার কোনো সখ নেই। পীর আবার কী? শুধু টাকা নেওযার ফন্দি।

তাওবা করি এ্যানা, এক্ষুণি তওবা কর। ইমিডিয়েট।

চুপ করুন তো। আমি তওবা-টওবা করতে পারব না!

তওবা না করলে আমি কিন্তু নেমে যাব।

এ্যানা বলল, নেমে যান। আপনাকে কে আটকাচ্ছে। আমি কী দড়ি দিয়ে আপনাকে বেঁধে রেখেছি?

হীরুর বাগ উঠে যাচ্ছে। রাগটা কনট্রোল করার জন্যে সে সিগারেট ধরাল। এ্যানা বলল, সিগারেট ফেলুন তো! চোখে ছাই পড়ছে।

ছাই পড়লে অসুবিধা কী? চোখ কী ক্ষয়ে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ, ক্ষয়ে যাচ্ছে।

তুমি বড় যন্ত্রণা কবছ এ্যানা।

আপনি নিজেই যন্ত্রণা করছেন। ফেলুন সিগারেট।

মেয়েছেলের কথায় ফস করে সিগারেট ফেলে দেয়া খুবই অপমানের ব্যাপার। তবু হীরু সিগারেট ফেলে দিল। দুনিয়াটাই এরকম যে মেয়েছেলের মন রক্ষা করে চলতে হয়।

এ্যানা বলল, নামার কথা বলে আবার দেখি বসে আছেন। আপনার লজ্জা নেই?

এইসব করলে কিন্তু সত্যি সত্যি নেমে যাব।

বেশ তো নেমে যান। এই রিকশা থাম তো উনি নামবেন।

রিকশা থামল। হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ে তাকে যন্ত্রণা দেবে। একে বিয়ে করলে জীবনটা ভাজা ভাজা হয়ে, যাবে। কিন্তু বিয়ে না করেই বা উপায় কী? প্রেম বলে কথা। প্রেম না থাকলে এতক্ষণে একটা চড় দিয়ে সে নেমে পড়ত। প্রেমের কারণে চড়টা দেয়া যাচ্ছে না।

এ্যানা বলল, কই নামলেন না?

মেয়েছেলে একা একা যাবে এই জান্যে বসে আছি।

একা একা যাওয়া আমার অভ্যাস আছে। আপনি নেমে যান। নেমে গেলেই ভাল।

ভাল কেন?

আপনাকে আমার অসহ্য লাগছে।

অসহ্য লাগার এমন কী করলাম? সিগারেট ফেলতে বলেছ। ফেলে দিয়েছি। মামলা ডিসমিস।

কেন খালি খালি কথা বাড়াচ্ছেন? এত বকবক করা শিখলেন কার কাছে? আপনার পীর সাহেবের কাছে?

এর পরে আর বসে থাকা যায় না।

হীরু নেমে গেল।

তার মনে ক্ষীণ আশা, রিকশা থেকে নামা মাত্র এ্যানা তার ভুল বুঝতে পারবে এবং মধুর গলায় বলবে, উঠে আসুন। হীরু অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে উঠবে না। এতে মান থাকে না। এ্যানা তখন বলবে, না হয় একটা ভুল করেছি। তাই বলে আপনি এমন করবেন? তখন হীরু উঠবে। কারণ মেয়েছেলের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা ঠিক না। মেয়েছেলের কাজই হচ্ছে ভুল করা। তারা ভুল করবেই। বিবি হাওয়া তাদের পথ দেখিয়ে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এ্যানা কিছুই বলল না। রিকশা ফরফর করে এগিয়ে চলল। রাগে হীরুর ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সে মনে মনে তিনবার বলল হারামজাদী, হারামজাদী, হারামজাদী। রাগ এতে পড়ে গেল। তিন সংখ্যার এই গুণ। রাগ করে তিনবার কোনো একটা কথা বললে রাগ পড়ে যায়। মন শান্ত হয়ে আসে।

হীরুর মন এখন শান্ত। বেশ অনুশোচনাও হচ্ছে, রিকশা থেকে নেমে পড়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। ইংরেজিতে যাতে যাকে বলে গ্রেট মিসটেক। বেচারীব কাছে রিকশা ভাড়া আছে

কি-না। কে জানে। মনে হচ্ছে নেই। বেচারী রিকশা থেকে নেমে মনটা খারাপ করবে; রিকশাওয়ালার সঙ্গে খচখচি করবে! আজিকাল রিকশাওয়ালারা মেয়েছেলের সম্মান রেখে কথা বলে না; মেয়েছেলের সঙ্গে ইচ্ছে করে যেন আরো খারাপ ব্যবহার করে।

হীরু একটা চায়ের স্টলে ঢুকে পড়ল। সারাটা দিন কী করে কাটাবে তার একটা পরিকল্পনা করা উচিত। সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার এ্যানার খোঁজে গেলে কেমন হয়? সঙ্গে একটা চিঠি নিয়ে যাবে। একটা মাত্র লাইন সেখানে লেখা থাকবে। এমন লাইন যে পড়া মাত্র মনটা উদাস হয়ে যায়। চোখ হয় ছলোছালো এ রকম লাইন খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট। চা খেতে খেতে এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

আজ হীরুর ভাগ্যটাই খারাপ। কাপ থেকে চা চুলকে পড়ল পাঞ্জাবিতে। চায্যের এই দাগ সহজে উঠবে না। দুধ দিয়ে ধুয়ে দিতে পারলে হয়ত উঠত। এখানে দুধ পাবে কোথায়? হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এ রকম যে হবে সে জানত। পীর সাহেবের নামে কেনা সিগারেট সে বিক্রি করে দিয়েছে। কাজেই একের পর এক অঘটন ঘটবে। এানা যে তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে দিল। এর কারণ তো আর কিছুই না পীর সাহেবের বরদোষা। এই জন্যেই পীর-ফকিরের সঙ্গে মেলামেশা কম করতে হয়। সব জিনিসের ভাল-মন্দ দু'টা দিকই আছে। পীর-ফকিরের সঙ্গে খাতির থাকা যেমন ভাল আবার তেমনি মন্দ। এখন মনে হচ্ছে মন্দটাই বেশি।

হীরু উদাস ভঙ্গিতে দ্বিতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

১২. আমার নাম দবির

জালালুদ্দিন বললেন, কে?

তিনি বারান্দায় এসে আছেন। সকাল নটার মত বাজে। বাড়িতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। মিনু গেছেন বাজারে। তিথি কোথায় গেছে। তিনি জানেন না। যাবার আগে তাকে বলে যায়নি। হীরু গত রাতে বাড়ি ফিরেনি। টুকু অবশ্যি রাতে বাড়িতেই ছিল। ভোরবেলা কোথায় বেরিয়ে গেছে। এই ছেলে কখন আসছে কখন যাচ্ছে কোনো ঠিক নেই। শক্ত মারধব করতে পারেন না। এই একটা সমস্যা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় মায়ের দায়িত্বটা তাকেই নিতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিতে হবে।

টুকু থাকলে সুবিধা হত। এই যে লোকটা এতক্ষণ এসেছে। কথাবার্তা বলছে না দাঁড়িয়ে আছে, তার ব্যাপারটা কি তা টুকু চট করে ধরে ফেলত। লোকটা কোনো বদ মতলবে এসেছে কিনা কে জানে।

জালালুদ্দিন আবার বললেন, কে?

লোকটি এইবার কথা বলল। তার গলার স্বর নরম এবং সে ইতস্তত ভঙ্গিতে কথা বলছে। কাজেই লোকটা সম্ভবত খারাপ না। খারাপ লোক এইভাবে কথা বলে না।

আমার নাম দবির। আমার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়নি।

দেখা হলেও চিনতাম না। আমি চোখে দেখি না।

তাই নাকি?

জালালুদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বিরাট যন্ত্রণায় আছি ভাই। আপনি বাইরের মানুষ। ভেতরের কথা আপনাকে কি বলব? সামান্য চিকিৎসা করালেই অসুখ সারে। সেটা কেউ করাবে না। আপনি কার কাছে এসেছেন?

দবির ইতস্তত করে বললেন, পরী কিংবা তিথি বলে কেউ কি এখানে থাকেন?

পরী বলে কেউ থাকে না। তবে তিথি আছে। আমার দ্বিতীয় কন্যা। ভাল নাম ইশরাত জাহান। ও কোথায় যেন গেছে।

কোথায় গেছে জানেন?

জি না। আমাকে কিছু বলে যায়নি। আগে বলত এখন আর বলে-টলে না। সম্ভবত ওর মাকে বলে গেছে। বসুন, ওর মা এসে পড়বে। ওর মা কাঁচার বাজারে গেছে। ঘরে কাজের লোক নেই। নিজেদেরই সব করতে হয়। ঐখানে একটা জলচৌকি আছে। টেনে নিয়ে বসুন। ঘরের ভেতর চেয়ার আছে, ঘরে তালা দিয়ে গেছে এই জন্যে চেয়ার দিতে পারছি না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

দবির বললেন, আমি বসব না। কাজ ফেলে এসেছি। আপনি দয়া করে তিথিকে বলবেন, আমি এসেছিলাম। নাম বললেই হবে। আমার নাম দবির তাকে একটু বলবেন যেন আমার বাসায় যায়। আমার স্ত্রীর কিছু কথা আছে তার সঙ্গে। জরুরি কথা।

বলব। অবশ্যই বলব। বাসার ঠিকানা কি তিথি জানে?

জি জানে। তাছাড়া এই কার্ডটাও রেখে গেলাম। কার্ডে ঠিকানা আছে।

বলব। তিথি আসলেই বলব। তা এসেছেন যখন খানিকক্ষণ বসেই যান। আমার স্ত্রী এসে পড়বেন। তখন চা খেতে পারবেন। কষ্ট করে এসেছেন। শুধু মুখে যাবেন। এটা কেমন কথা।

জি না। আজ আর বসব না।

জালালুদ্দিন খানিকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত থেকে বললেন, ভাইসাব আপনার কাছে সিগারেট আছে? প্যাকেটটা রয়েছে ভেতরে। আমার স্ত্রী ঘরে তালা দিয়ে চলে গেলেন। চাবিটাও নেই। থাকলে আপনাকে বলতাম না।

দবির বললেন, সিগারেট তো আমি খাই না। তবে এনে দিচ্ছি।

তাহলে দরকার নেই। বাদ দেন। সঙ্গে থাকলে ভিন্ন কথা।

কোনো অসুবিধা নেই।

জালালুদ্দিন, এই অপরিচিত লোকটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা এক প্যাকেট ফাইভ ফাইভ এবং একটা দিয়াশলাই কিনে দিয়ে গেছে। শুধু তাই না। একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে গেছে। এরকম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মেয়ের পরিচয় আছে ভাবতেই ভাল লাগছে। এমন চমৎকার একজন মানুষকে চা খাওয়ানো গেল না। এই দুঃখে তিনি খুবই কাতর হয়ে পড়লেন, পরের বার এলে চা এবং চায়ের সঙ্গে দু'টা মিষ্টি দিতে হবে। এইটুকু ভদ্রতা না করলে খুবই অন্যায় হবে।

মিনু চলে এসেছেন। তাঁর পায়ের শব্দ কানে যেতেই জালালুদ্দিন সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেললেন। মেয়েদের মন থাকে সন্দেহে ভরা। হাজারটা প্রশ্ন করবে। কি দরকার? তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বাজার কি আনলে মিনু?

মিনু জবাব দিলেন না। স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেয়া তিনি ইদানীং ছেড়েই দিয়েছেন।

মাছ-টাছ কিছু পাওয়া গেল?

মিনু সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। না। বাজার নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। জালালুদ্দিন তাতে মন খারাপ করলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, এক ফোঁটা চা দিও তো মিনু। বুকে কফ বসে গেছে। চা কফের জন্যে খুবই উপকারী। আমার কথা না। বড় বড় ডাক্তাররা বলেন।

মিনু এই কথায় ঝাঝিয়ে উঠলেন না। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। হয়ত চা পাওয়া যাবে। চা এলে চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরাতে হবে। সব জিনিসের একটা অনুপান আছে। চায়ের অনুপান হচ্ছে সিগারেট। দৈ-এর অনুপান মিষ্টি।

তিথির অবাক হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

কিছুতেই সে এখন আর অবাক হয় না। হীরু যদি তাকে কোনোদিন এসে বলে, দেখ তিথি আমি এখন আকাশে উড়তে পারি। এবং সত্যি সত্যি যদি খানিক্ষণ উড়ে দেখায়, তাহলেও বোধ হয়। তিথি অবাক হবে না।

অথচ দাবির উদ্দিনের রেখে-যাওয়া কার্ড দেখে সে অবাক হল। এই লোক তার ঠিকানা পেল কোথায়? সে তো কোনো ঠিকানা রেখে আসেনি। তার ঠিকানা জানার কথা নয়! দবির উদ্দিনের স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলতে চান। এই খবরটিও অবাক হবার মত। তাতে তিথি অবাক হল না। ভদ্রমহিলা অসুস্থ, তার নিশ্চয়ই সময় কাটে না। গল্পগুজব করবার জন্যে তার কিছু মজার চরিত্র দরকার। তিথির মত মজার চরিত্র তিনি আর কোথায় পাবেন।

ঐ বাড়িতে তিথির যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু সে হয়ত যাবে। দবির উদ্দিন নামের ঐ লোক তার ঠিকানা কোথায় পেল এটা জানার জন্যেই তাকে যেতে হবে। আর যেতে যখন হবে তখন আজি গেলে কেমন হয়?

তিথি কাপড় বদলাল।

হালকা রঙের একটা শাড়ি পরল। চুলে বেণী করল। আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবল একটু কাজল কি দেবে? চোখের পল্লব ঘেঁষে হালকা রেখা যা চোখে পড়বে না। আবার পড়বেও।

মিনু ঘরে ঢুকে দেখলেন তিথি খুব সাবধানে চোখে কাজল দিচ্ছে। তিথি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিথি বলল, তুমি কিছু বলবে?

না।

তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও।

মিনু ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুই কি আমাকে দেখতে পারিস না। তিথি? তিথি মার দিকে না। তাকিয়ে বলল, না। পারি না।

আমি কি করেছি? আমার দোষটা কী?

তোমাকে কি আমি কোনো দোষ দিয়েছি? দোষ ছাড়াই তোমাকে দেখতে পারি না।

মিনু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, অরু চিঠি দিয়েছে।

তিথি কিছু বলল না।

মিনু বললেন, তোর টেবিলের উপর রেখেছি।

আমার টেবিলের উপর রেখেছ কেন? আমি ঐ সব চিঠি-ফিঠি পড়ব না। ভাল্লাগে না।

মিনু চলে গেলেন। তিথি অবশ্যি ঘর থেকে বেরুবার আগে বোনের চিঠি পড়ল। একবার না। দুবার পড়ল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মার কাছে লেখা।

মা,

আমার সালাম নিও। আমি বুঝতে পারছি, তোমাবা ওর টাকাটা দিতে পারছ না কিংবা দিচ্ছ না। আমি ঐ নিয়ে আর কিছু বলব না। কিন্তু মা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে কিছু দিন তোমাদের কাছে এনে রাখ। এখানে আমি মরে যাচ্ছি। হীরুকে পাঠাও মা, আমাকে নিয়ে যাক।

তোমার অরু।

এত সংক্ষিপ্ত চিঠি অরু কখনো লেখে না। তার চিঠি হয় দীর্ঘ। চিঠির শেষের দিকে এসে বাবার বাড়ির সবার সম্পর্কে কিছু না কিছু লেখা থাকে। এই চিঠিতে সে সব কিছু নেই। তিথি ভাবতে চেষ্টা করল। বড়। আপা কি ধরনের কষ্টে আছে? কষ্টের নমুনাটা কি? বড় আপার কষ্টের সঙ্গে তার নিজের কষ্টের কি কোনো মিল আছে? সম্ভবত নেই। সে যে জাতীয় যাতনা বোধ করছে বড় আপার সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, ধারণা থাকার কথাও না। তার বয়স তখন কত? পনেরো কি ষোল? এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনো রেজাল্ট হয়নি। বাবা তাকে পাঠালেন। মনজুর সাহেবের কাছে। বাবার দূর-সম্পর্কের ভাই। তিথি তাকে কখনো দেখেনি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ জি অফিসে কাজ করেন। থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। তাকে একটা চিঠি দিতে হবে। চিঠিটা বাবার জবানীতে লিখেছে। তিথি। চিঠির বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ জালালুদ্দিন সাহেব তাঁর ফুফাতো ভাইকে জানাচ্ছেন যে তিনি সাময়িকভাবে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। যদি দুশ টাকা তাকে দেয়া হয় তাহলে তিনি চির কৃতজ্ঞ থাকবেন। টাকাটা তিনি সামনের মাসে যে করেই হোক ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি নিজেই আসতেন ইদানীং চোখের একটা সমস্যার জন্যে আসতে পারছেন না।

চিঠি নিয়ে যাবার কথা হীরুর। সে গম্ভীর গলায় বলল, এটা তো ভিক্ষা চাওয়া চিঠি। যাকে বলে বেগিং। আমি বেগিং বিজনেসে থাকতে পারব না। জালালুদ্দিন কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলেন না। শেষটায় মেয়েকে বললেন, তুই যাবি তিথি? গভর্মেন্ট কোয়ার্টার। খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না। পারবি মা?

তিথি বলল, উনি যদি চিনতে না পারেন?

বলিস কি তুই? চিনতে পারবে না। মানে! পরিচয় পেলে দেখবি কত খাতির-যত্ন করে।

টাকা যদি না দেন তাহলে তো বাবা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

তোর কিসের লজ্জা? তুই তো আর টাকা চাসনি। আমি চেয়েছি। লজ্জা হলে আমার হবে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি খুব খারাপ ব্যবহার করবেন! বিরক্ত হবেন।

আহা গিয়ে দেখি না। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

যদি চিনতে না পারেন?

মনজুর সাহেব তাকে চিনতে পারলেন। হাসিমুখে বললেন, তোমাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তোমার মনে নেই। তবে তোমার বড় বোনের নিশ্চয়ই মনে আছে। কি নাম যেন তার? অরুমিনা না?

জি। ডাকনাম অরু।

তোমার বাবার তো আমার খুব কাব্যিক নাম রাখার বাতিক। তোমার নাম কি?

তিথি।

বাহ খুব সুন্দর নাম। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। তিথিদের অবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, এই সাময়িক সাহায্য তো কিছু হবে না। স্থায়ী কিছু করতে হবে। কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে কথা। তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দিও। আমার কিছু জানাশোনা আছে দেখি কোথাও লাগিয়ে দেয়া যায় কি-না। তিথির মনে যে চাপা উদ্বেগ ছিল তা দূর হয়ে গেল। বাবার এই ফুফাতো ভাইকে তার পছন্দ হল। ছোটখাটো মানুষ। সারাক্ষণ পান খাচ্ছেন। একটু পরপর পানের রস গড়িয়ে পড়ছে। সরুয়া টানার মত সেই রস টেনে নিচ্ছেন। মাথায় এক গাছিও চুল নেই। চকচকে টাকা। কিছুক্ষণ পরপর টাকে হাত বুলাচ্ছেন। তখন তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় টাকে হাত বুলিয়ে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন। তিথি খানিক গল্পগুজবও করল। সহজ স্বরে বলল, বাসায় আর কেউ নেই কেন? চাচী কোথায়?

ও থাক, গফরগাঁয়ে। ছেলেমেয়েরা ঐখানেই স্কুলে-কলেজে পড়ে। ঢাকার এত খরচ চালান কি সোজা ব্যাপার। সরকারি বাসা পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে। অর্ধেক সাবলেট করে দিয়েছি। আমি দু'টা ঘর নিয়ে থাকি।

একা একা খারাপ লাগে না আপনার?

না। সপ্তাহে সপ্তাহে যাই। বৃহস্পতিবারে দুপুরে চলে যাই শনিবার সকালে আসি। খানিকটা কষ্ট হয়। কি আর করা বল।

খাওয়া-দাওয়া কোথায় করেন?

বেশির ভাগ সময় নিজেই রাঁধি। বাইরেও খাই।

তিনি তিথিকে সুজির হালুয়া রেঁধে খাওয়ালেন। দু'শ টাকা দিয়ে নিজে এসে একটা রিকশা ঠিক করে রিকশা ভাড়াও দিয়ে দিলেন। তিথিকে বললেন, একা একা ঢাকা শহরে ঘোরাফিরা করা ঠিক না। তোমার বাবাকে বলবে। আর যেন তোমাকে এ ভাবে না পাঠান।

তিথিকে পরের মাসে আবার আসতে হল। এবারের আবেদন একশ টাকার। যে করেই হোক দিতে হবে।

মনজুর সাহেব টাকা দিয়ে দিলেন এবং সেদিনও সুজির হালুয়া রোধে খাওয়ালেন। তবে ঐ দিনের মত গল্পগুজব হল না বা এগিয়ে এসে রিকশা ঠিক করে দিলেন না।

তার পরের মাসে তিথি আবার এল। সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে আসল। টাকা চাইতে হবে এই দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। বাসে বসে তার মন চাইছিল একটা ট্রাকের সঙ্গে এই বাসটার অ্যাকসিডেন্ট হোক। সেই অ্যাকসিডেন্টে সে যেন মারা যায়। সে মরল না। এক সময় মনজুর সাহেবের বাসার কড়া নাড়ল। মনজুর সাহেব দরজা খুললেন তবে তাকে দেখে খুব অবাক হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কি খবর? তিথি মাথা নিচু করে বলল, বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন।

আবার চিঠি। এস ভেতরে এস। তিথি ভেতরে এসে বসল। মনজুর সাহেব বললেন, এইবার কত টাকা চেয়েছে?

একশ।

তিথির ধারণা ছিল এবারে তিনি টাকা দেবেন না। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি পঞ্চাশ টাকার দু'টা নোট তিথির হাতে দিলেন এবং বললেন, ঘেমে-টেমে কি হয়েছে ফ্যানের নিচে বস। বিশ্রাম কর।

জি-না। তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। টুকুর খুব জ্বর। ডাক্তার আনতে হবে।

দুতিন মিনিট বসে গেলে ক্ষতি হবে না। তিনি হাত ধরে তিথিকে তার পাশে বসলেন। পরমুহূর্তেই তিথিকে জড়িয়ে ধরলেন। তিথি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোনোমতে বলল, ছাড়ুন চাচা। আমাকে ছেড়ে দিন।

তিনি আহ্ বলে বিরক্ত প্রকাশ করলেন। তিথিকে ছাড়লেন না। তিথি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। সিগারেটের গন্ধ ভরা, পান খাওয়া একটা মুখ তার মুখের ওপর লেপ্টে রইল। দু'টি হাত মাকড়সার মতো তার সারা শরীরে কিলবিল করতে লাগল। এর পর কি কি ঘটল। সে মনে করতে পারছে না। শুধু যা মনে আছে তা হচ্ছে সে বেতের সোফায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মনজুর সাহেব একটা বাটিতে হালুয়া বানিয়ে তাকে বললেন এই তিথি, নাও হালুয়া খাও। এর পরেও অনেকবার তিথিকে তার

কাছে আসতে হয়েছে। প্রতিবারেই মনজুর সাহেব তাকে টাকা দিয়েছেন। এবং বলেছেন, দরকার হলেই আসবে। কোনো অসুবিধা নেই।

তিথি বড় আপার চিঠি টেবিলে রাখতে রাখতে মৃদু স্বরে বলল, তুমি তো সুখেই আছ আপা। কত সুখে আছ তুমি জানো না। জানলে এ রকম চিঠি লিখতে না।

এ হচ্ছে নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলা। নিজের সঙ্গে কথা বলার এই অদ্ভুত অসুখ তিথির ইদানীং হয়েছে। মনে মনে ভাবা কথাগুলি সশব্দে বের হয়ে আসে। রিকশায় আসতে আসতে একবার এরকম হল। রিকশাওয়ালা তিথির বিড়বিড় শুনে চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, কি কন আফা? এগুলি কি পাগল হবার লক্ষণ? এক সময় সে কি পাগল হয়ে যাবে? হয়ত হবে। কিংবা কে জানে এখনি হয়ত সে খানিকটা পাগল।

বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে হীরুর সঙ্গে দেখা! হীরু বলল, তিথি যাচ্ছিস কোথায়? তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে, ভেরি আর্জেন্ট।

তিথি বলল, আমার কোনো জরুরি কথা নেই। বিরক্ত করিস না তো?

হীরু সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। তিথি বলল, কেন বিরক্ত করছিস?

তুই আমাকে থ্রি থাউজেন্ড টাকা জোগাড় করে দিতে পারবি?

না।

এর জন্যে তুই আমাকে তোর পা ধরতে বলিস। আমি তোর পা ধরে বসে থাকব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।

দরকার হলে চুরি কর। ছিনতাই কর। কানে দুল পরে মেয়েরা যায়। ঐ দুল টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যা।

তুই পাগল হয়ে গেলি তিথি? আমি ভদ্রলোকের ছেলে না?

হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ছেলে। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমি টাকা কিভাবে আনি তুই জানিস? নাকি তোর জানা নেই?

হীরু চুপ করে গেল। তিথি বলল, আমি কিভাবে টাকা আনি সেটা কেউ জানে না, আবার সবাই জানে। মজার একটা খেলা। তুই আমার পেছন পেছন আসবি না। যদি আসিস তাহলে ধাক্কা দিয়ে নর্দমায় ফেলে দেব।

হীরু দাঁড়িয়ে পড়ল। তিথিকে বিশ্বাস নেই। এই কাণ্ড সে সত্যি সত্যি করে বসতে পারে। একবার নর্দমায় পড়ে গেলে চৌদবার গোসল করলেও গন্ধ উঠবে না। হীরুর মন খারাপ হয়ে গেল। তিথির কাছ থেকে সে টাকা পাবে না এটা জানত। টাকা চাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। হীরুর ধারণা ছিল টাকার কথা শুনেই তিথি বলবে এত টাকা দিয়ে তুই কি করবি? তখন হীরু কারণটা ব্যাখ্যা করবে।

কারণটা বেশ অদ্ভুত।

আজ হাঁটতে হাঁটতে সে পীর সাহেবের কাছে গিয়েছে। খালি হাতে গিয়েছে, এই জন্যে সে আর তার সঙ্গে দেখা করল না। উঠোনে মাথা কামানো এক লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মাথা কামানো লোকটির নাম সবুর। তার বাড়ি কালিয়াকৈর। মাস তিনেক আগে বিয়ে করেছে। গত সপ্তাহে তার বৌ হঠাৎ পালিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করেও সে কোনো সন্ধান না পেয়ে পীর সাহেবের কাছে এসেছে। পীর সাহেবের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। হীরু বলল, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন ভাইজান। মোটেই চিন্তা করবেন না, এক মিনিটের মামলা। পীর সাহেব ফড়ফড় করে সব বলে দেবেন।

সত্যি?

সত্যি মানে? আমার নিজের ইয়ং ব্রাদার মিসিং হয়ে গেল। তার নাম টুকু। পীর সাহেবকে বললাম। উনি বললেন–চিন্তা করিস না। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরবে।

ফিরল এক সপ্তাহের মধ্যে?

ফিরবে না মানে? পীর সাহেবের সঙ্গে ইয়ার্কি চলে না। ডাইরেক্ট অ্যাকশান। আপনি খালি হাতে আসেননি তো?

একশ টাকা এনেছি, গরিব মানুষ।

টাকা-পয়সা পীর সাহেব নিবেন না। টাকা-পয়সা উনার কাছে তেজপাতা। সিগারেট দিতে হবে, বিদেশী সিগারেট।

বিদেশী কি সিগারেট?

ধরেন ডানাহিল, বেনসন। মোড়ের দোকানে গিয়ে বললেই হবে–পীর সাহেবের সিগ্রেট। ওরা জানে। বাজারের চেয়ে কম রেইটে পাবেন। যান সিগ্রেট নিয়ে আসেন। পীর সাহেবকে কদমবুসি করে সিগ্রেটের প্যাকেটটা বাম দিকে রাখবেন।

সবুর মিয়া সিগ্রেট আনতে গেল আর তখনি বাড়ির ভেতর থেকে পীর সাহেব খালি পায়ে বের হয়ে এলেন। বারান্দায় এবং উঠোনে এতগুলি লোক বসা, কাউকে কিছু না বলে হীরুকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। হতভম্ব হীরু ছুটে গেল। পীর সাহেব বললেন, তুই বিসমিল্লাহ বলে একটা ব্যবসা শুরু কর। ব্যবসা তোর তরক্কি হবে। স্বয়ং নবী করিম ব্যবসা করতেন। হীরু কাঁপা গলায় বলল, কিসের ব্যবসা করব? পীর সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, তোর ব্যবসা হবে গরম জিনিসের। একটা চায়ের দোকান দিয়ে দে। এই বলেই পীর সাহেব। আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। আর কি আশ্চর্য যোগাযোগ তার পরদিনই যে কল্যাণপুরের বশীর মোল্লার চায়ের দোকানে চা খেতে গেছে, বশীর মোল্লা বলল, দোকান বেচে দিব। হীরু ভাই। খদ্দের যদি পান একটু বলবেন।

হীরু গম্ভীর হয়ে বলল, বেচবেন কেন? চালু দোকান।

চালু কোথায় দেখলেন? দিনে পঞ্চাশ কাপ চা বেচতে পারি না। বিশ-পাঁচিশ কাপ পাড়ার ছেলেরা খায়। দাম চাইলে বলে খাতায় লিখে রাখেন।

দাম কত চান দোকানের?

দশ হাজার পাইলে রাখমু না।

দশ হাজার? দোকানে আপনার আছে কি? দুইটা কেতলী, পনের-বিশটা কাপ। হাজার তিনেক হলে আমাকে বলবেন ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যাব। নো প্রবলেম।

বশীর মোল্লা আর কিছু বলল না। চিন্তিত মুখে দাঁত খুঁচাতে লাগল। এই সবই হচ্ছে যোগাযোগ। এরকম যোগাযোগ আপনা-আপনি হয় না। উপরের নির্দেশ লাগে। পীর সাহেবের দোয়ায় অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। এরা হচ্ছেন অলি মানুষ এদের দোয়া কোরামিন ইনজেকশনের মত। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন।

হীরুর ইচ্ছা ছিল টাকা চাওয়ার উপলক্ষে পুরো ঘটনাটা তিথিকে বলবে। তিথি সেই সুযোগ দিল না। পীর সাহেবের দোয়ার ফল তো সে একা ভোগ করবে না। সবাই মিলে ভোগ করবে। তার টাকা-পয়সা হলে সে কি ভাই বোন ফেলে দিবে? অবশ্যই না। ভাই-বোন, ফাদার-মাদার এরা থাকবে মাথার উপরে।

১৩. ফরিদার চোখ দু'টি

ফরিদার চোখ দু'টি আজ যেন উজ্জ্বল আরো তীক্ষ্ণ। চুলার গানগনে কয়লার মত ঝকঝকি করছে। তার পরনের শাড়িটাও লাল। মাথার চুলগুলিও কেন জানি লালচে দেখাচ্ছে। শুধু মুখের চামড়া আরো হলুদ হয়েছে। এমন হলুদ যে মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁলে হাতে হলুদ রঙ লেগে যাবে। ফরিদা বললেন, বস তিথি। চেয়ার টেনে বস।

তিথি বলল, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

ফরিদা চুপ করে রইলেন তবে খুব আগ্রহ নিয়ে তিথির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের মণিতে এক ধরনের কৌতুক। এক সময় হাসিমুখে বললেন, তুমি কি চোখে কাজল দিয়েছ না-কি?

তিথি শান্ত স্বরে বলল, হ্যাঁ দিয়েছি। কেন, আমার মত মেয়ের কি চোখে কাজল দেয়া নিষেধ?

ফরিদা তিথির প্রশ্নের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দিলেন না। নিজের মনে বললেন, বিয়ের আগে আমারও চোখে কাজল দেয়ার সখ ছিল। খুব কাজল দিতাম। এক'দিন আমার মামা আমাকে বললেন, চোখে কাজল দেয়া ঠিক না। কাজল হচ্ছে কারবন। কারবনের সূক্ষ্ম কণা চোখের ক্ষতি করে। ঐ মামার কথা আমরা খুব বিশ্বাস করতাম...

তিথি ফরিদাকে থামিযে বলল, আপনি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন?

গল্প করার জন্যে। কেন তুমি কি রাগ করছ? আমি পুষিয়ে দেব।

কিভাবে পুষিয়ে দেবেন? গল্পের শেষে টাকা দেবেন ঘণ্টা হিসেবে?

ফরিদা হেসে ফেললেন। যেন তিথি খুব মজার কিছু বলেছে। তিথি বিস্মিত হল। ফরিদা কেন হেসে ফেলেছে তা বুঝতে না পেরে খানিকটা বিব্রত ও বোধ করল।

ফরিদা বললেন, ঐ দিন তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। তারপব থেকে আমার মনটা খারাপ ছিল। নিজের পরিচিত মানুষজন, আত্মীয়-স্বজন যদি রাগ করে আমার খারাপ লাগে না। তুমি বাইরের একটি মেয়ে। তুমি কেন আমার ওপর রাগ করবে?

আপনি কি এটা বলার জন্যে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। আমার আরেকটা উদ্দেশ্যও আছে। সেটা তোমাকে পরে বলছি। তার আগে তোমার জন্যে একটা ধাঁধা আছে। এখানে একটা ছবি আছে। এই ছবিতে তিনটি মেয়ে বসে আছে। এই তিনজনের একজন আমি। সেই একজন কে তুমি বের করে দেবে।

যদি বের করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা দেবেন?

তুমি চাইলে দেব। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন কঠিন ভাষায় কথা বলছ কেন? খানিকক্ষণ সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল। অসুস্থ একজন মানুষের এই কথাটা রাখ।

তিথি ছবিটা হাতে নিল। দেখেই মনে হচ্ছে তিন স্কুল বান্ধবী কোনো উপলক্ষে প্রথম শাড়ি পরেছে। তিনজনই হাত ধরাধরি করে বসে আছে। পেছনে গোলাপ ঝাড়ে অনেক গোলাপ ফুটে আছে। ফটোগ্রাফার নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে এই কম্পোজিশন বের করেছেন।

দেরি করছ কেন? বল কোন মেয়েটি আমি?

বলতে পারছি না।

মেয়েগুলি দেখতে কেমন?

রূপবতী।

কি রকম রূপবতী সেটা বল।

খুব রূপবতী।

এই তিনটি মেয়ের মধ্যে আর কোনো মিল দেখতে পাঁচ্ছ?

না!

খুব ভাল করে দেখা। আলোর কাছে নিয়ে দেখ।

আমি আর কোনো মিল দেখতে পাচ্ছি না। তিনটি মেয়ের মুখ তিন রকমের।

আরেকটা মিল আছে। এই তিনজনের চিবুকের কাছে তিল আছে। ছবিতেও বোঝা যায় আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। গলায় গলায় বন্ধু। ধর আমাদের মধ্যে একজনের অসুখ হয়েছে সে স্কুলে যায়নি। আমরা দু'জন স্কুলে গিয়ে যখন দেখতাম একজন আসেনি তখন আমরাও স্কুল ফেলে বাসায় চলে আসতাম।

আপনাদের চিবুকে তিল ছিল বলেই আপনাদের এত বন্ধুত্ব ছিল?

শুধু তিল না। আরো অনেক মিল ছিল আমাদের মধ্যে। আমরা তিনজনই বেশ ভাল ছাত্রী ছিলাম। একজন তো ছিল খুবই ভাল ছাত্রী। স্কুলে বরাবর ফাস্ট সেকেন্ড হত। অথচ ম্যাট্রিক রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল। তিনজনই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছি।

তাই নাকি?

কলেজে ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই তিনজনের বিয়ে হয়ে গেল। তার পরেও মিল আছে। বল তো মিলটা কি?

আপনারা তিনজনই এখন অসুস্থ?

না। দু'জন মারা গেছে। আমি শুধু বেঁচে আছি। এই বাঁচা তো মৃত্যুর মতই। তাই না?

হ্যাঁ তাই! আপনার ঐ দুই বান্ধবী কিভাবে মারা গেলেন?

প্রথম মারা গেল তৃণা। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। তারপর মারা গেল বরুনা। ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ফরিদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাতের ইশারায় তিনি তিথিকে পানির গ্লাস আনতে বললেন। তিথি পানি এনে দিল। সবটা খেতে পারলেন না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। তিথি বলল, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

কোনো ওষুধপত্র কি আছে যা খেলে কষ্ট কমবে?

না।

আমি কি চলে যাব? নাকি আপনি আমাকে আরো কিছু বলবেন?

ফরিদা চোখ না মেলেই বললেন, যাও।

তিথি বলল, আপনার কি খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

আমি বরং আপনার পাশে বসে থাকি। ব্যথা যখন আরেকটু কমবে তখন যাব।

ব্যথা কমবে না। তুমি যাও।

তিথি উঠে দাঁড়াতেই ফরিদা বললেন, একটু বস। তিথি বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদা চোখ মেলে তাকালেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, তোমার নিচের চিবুকেও তিল আছে এটা কি তুমি কখনো লক্ষ্য করেছ? তিথি কিছু বলল না। ফরিদা কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার ভাগ্য ও আমার মতই হবে।

হলে কি আপনি খুশি হন?

না খুশি হই না।

তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তার বন্ধ চোখের পাতা উপচে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। তিথি ফরিদার চোখের পানি দেখে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গেল। তার নিজের বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে লাগল।

ফরিদা বললেন, তুমি কি একটু অজন্তার বাবাকে ডেকে আনবে? পাঁচটার মধ্যে সে আসে। এখন পাঁচটা দশ বাজে। সে নিচে আছে।

তিথি দবির উদ্দিনকে পেল না। বসার ঘরে অজন্তা একা একা বসে ছিল। সে বলল, বাবা ছিলেন, আপনি এসেছেন শুনে শার্ট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। বলতে বলতে অজন্তা মুখ টিপে হাসল। এবং একটু যেন লজ্জাও পেল। এই লজ্জার কারণ তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

১৪. অরু এসে উপস্থিত

ভাদ্র মাসের শুরুতে অরু এসে উপস্থিত। হাতে একটা সুটকেস। তাকে নিয়ে এসেছে। সদ্য গোঁফ উঠা মুখচোরা ধরনের এক ছেলে। ভীতু ছাউনি, একবারও মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে না। স্যুটকেস নামিয়ে রেখেই সে উধাও হয়ে গেল। মিনু বললেন, ব্যাপার কি রে?

অরু মায়াকান্না জুড়ে দিল।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা কথা থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে– স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে পালিয়ে এসেছে। যে তাকে পৌঁছে দিয়েছে তার নাম সাঈদ। কলেজে আইকম পড়ে। পাশের বাড়িতে লজিং থাকে। মিনু কঠিন গলায় বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পেটে ছয় মাসের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে চলে এলি? তার আগে বিষ খেয়ে মরতে পারলি না। বাজারে বিষ পাওয়া যায় না?

অরু শুকনো গলায় বলল, সব কিছু না শুনেই তুমি এই কথা বললে? বেশ, বিষ এনে দাও আমি খাব। সময় তো শেষ হয়ে যায়নি।

জালালুদ্দিন বললেন, কি শুরু করলে মিনু, মেয়েটা একটু ঠাণ্ডা হোক। সব আগে শুনি। না শুনেই বকাঝকা।

মিনু ঝাঝিয়ে উঠল, সব কিছুর মধ্যে কথা বলবে না। কথা শোনা শুনির এখানে কি আছে? বোকার বেহদা মেয়ে। পেটে ছমাসের বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে। কি সর্বনাশের কথা!

জালালুদ্দিন বললেন, একটা ব্যবস্থা হবেই। এত চিন্তার কি? বিপদ দেবার মালিক যিনি, বিপদ ত্রাণ করার মালিকও তিনি। তুমি এক কাপ গরম চা মেয়েটিকে দাও। মুড়ি থাকলে তেলমরিচ দিয়ে মেখে দাও। অরু মা, তুই আয় আমার কাছে। ঘটনা কি শুনি। মিনু বললেন,

তোমাকে কোনো ঘটনা শুনতে হবে না।

তিনি মেয়েকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এখন বল কি হয়েছে? তোর এত বড় সাহস কেন হল শুনি! অরু কিছুই বলল না, মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সমস্ত দিনেও এই কান্না থামল না।

তিথি এল চারটার দিকে। তিথিকে দেখে অরুর কান্না আরো বেড়ে গেল। জালালুদ্দিন বললেন, মেয়েটা কিছুই খায়নি। তিথি মা দেখ তো কিছু খাওয়াতে পারিস কি-না! বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। বেশি কান্না ভাল না। চোখের ক্ষতি হয়।

হীরু এল সন্ধ্যার আগে আগে। সে কিছু না শুনেই খুব লাফঝাপ দিতে লাগল–দুলাভাই বলে রেয়াত করব না। চটি জুতা দিয়ে পিটিয়ে চামড়া ঢিলা করে দেব। দাঁত সব কটা খুলে ফেলব। শালাকে ডেনটিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত বাধাতে হবে। তিথি এসে ধমক দিয়ে হীরুকে থামাল। এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টেলিগ্রাম করতে পাঠাল। টেলিগ্রাম করা হবে। আবদুল মতিনকে। সেখানে লেখা থাকবে, অরু এখানে আছে। চিন্তার কোনো কারণ নাই।

হীরু টেলিগ্রাম করে টাকা নষ্ট করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না। বললেই হবে–টেলিগ্রাম করা হয়েছে। চিঠি যদি মিস হতে পারে তাহলে টেলিগ্রাম ও হতে পারে। বর্তমানে হাত একেবারেই খালি! টেলিগ্রাম উপলক্ষে পাওয়া বিশ টাকার নোটটা কাজে লাগবে। হীরু চলে এল ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে।

এ্যানার মা চারদিন হল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বেশির ভাগ সময় রাতে এ্যানা তাঁর সঙ্গে থাকে। ভাগ্য ভাল হলে আজও হয়ত সেই আছে।

অবশ্যি হাসপাতালে গিয়েও কোনো লাভ হবে না। ভদ্রমহিলার এখন-তখন অবস্থা। সারাক্ষণই নাকে অক্সিজেনের নল ফিট করা। মাকে এই অবস্থায় ফেলে মেয়ে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বকবক করবে না। তবু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

ফিমেল ওয়ার্ডের দোতলায় জানালা ঘেঁষে এ্যানার মার বেড়। ফিমেল ওয়ার্ডে যাবার ব্যাপারে খানিকটা কড়াকড়ি আছে। হীরুর তেমন সমস্যা ছিল না। কলাপসেবল গেটের দারোয়ানকে কাঁদো। কাঁদো গলায় বলল, ভাই আমার মা ছিলেন হাসপাতালে। মারা গেছেন এ রকম সংবাদ পেয়ে এসেছি। একটু যদি কাইন্ডলি...

হাসপাতালের লোকজনও মৃত্যুর খবরে বিচলিত। দারোয়ান তাকে ছেড়ে দিল। হীরু চলে এল দোতলায়। আশ্চর্য ব্যাপার এ্যানা বারান্দাতেই আছে! রেলিং-এ ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁদছে নাকি? তার মার কি ভাল-মন্দ কিছু হয় গেল? তেমন কিছু হলে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলার কথা। হাসপাতালে বোধ হয় সে রকম কিছু করার নিয়ম নেই।

এই এ্যানা?

এ্যানা চমকে তাকাল। বিরক্ত গলায় বলল, আবার হাসপাতালে চলে এসেছেন? পরশু দিন না বললাম হাসপাতালে আসবেন না।

তোমার কাছে তো আসিনি। আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড ইমতিয়াজ, ব্যাটার হঠাৎ পেটে ব্যথা, অ্যাপেনডিসাইটিস-ফাইটিস হবে। হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, ব্যাটার এখন অপারেশন হচ্ছে। অপারেশন হওয়া পর্যন্ত থাকতেই হবে। কাজেই ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই। তোমার মা, তার মানে বলতে গেলে আমারো মা।

আপনার মা হবে কেন? কি-সব উল্টাপাল্টা কথা বলেন!। এইসব আর করবেন না। রাগে গা জ্বলে যায়।

উনি আছেন কেমন?

তা দিয়ে আপনার দরকারটা কি? মার খোঁজে তো আপনি আসেননি।

তোমার মার খোঁজে আসিনি– তাহলে এলাম কেন?

এসেছেন আমাকে বিরক্ত করতে।

হীরু অতি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, নিচু গলায় বলল, এখানে সিগারেট খাওয়া যায় এ্যানা?

না, খাওয়া যায় না। আপনি এখন চলে যান তো।

তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো কেন?

মা ঘুমুচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে আছি।

তুমি ঘুমাও কোথায়?

ঘুমাবো। আবার কোথায়? এখানে কেউ কি আমার জন্যে বিছানা করে রেখেছে?

সারা রাত জেগে থাক?

হুঁ, অনেকেই বারান্দায় চাদর পেতে ঘুমায়। আমি পারি না। ঘেন্না লাগে।

বলতে বলতে এ্যানা হাই তুলল। বেচারীর শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ভেজা ভেজা চোখ। মুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে। হীরুর মনটা মায়ায় ভরে গেল। সে কোমল গলায় বলল, চা খাবে নাকি এ্যানা?

কি-সব কথাবার্তা আপনার। এখানে চা খাব কোথায়? এটা কি রেস্টুরেন্ট?

হাসপাতালের গেটের ভেতর এক বুড়ে চা বিক্রি করছে। চা খেলে তোমার রাত জাগতে সুবিধা হবে। চল না।

এক কাপ চা খেলেই আপনি চলে যাবেন?

চলে যাব না তো কি? আমার ঐ ফ্রেন্ডের অপারেশনের কি হল খোঁজখবর করে বাসায় যেতে হবে। বিরাট সমস্যা বাসায়। আমার বড় বোন পালিয়ে চলে এসেছে। হেভি ক্রাইং হচ্ছে।

আপনার বাসাটা তো খুব অদ্ভুত। সব সময় কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। কিংবা পালিয়ে আসছে।

হীরু এর উত্তর দিল না। তার বড় ভাল লাগছে। রাতের বেলা এ্যানাকে পাশে নিয়ে চা খাওয়া, এত আনন্দ সে রাখবে কোথায়? মেয়েটা যে তার দিকে কি রকম উইক এই ঘটনায় তাও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় চা খেতে চলল। এদিকে তার মা এখন-তখন অবস্থা। মুখে অবশ্যি এই মেয়ে সারাক্ষণ উল্টো কথা বলছে। তা বলুক, এটা মেয়েছেলের ধর্ম। সোজা কথা সোজাভাবে বললে আর মেয়েছেলে রইল কোথায়?

চায়ে চুমুক দিয়ে এ্যানা বলল, চাটা তো ভাল। হীরু দরাজ গলায় বলল, ভাল লাগলে আরেক কাপ খাও।

এ্যানা হেসে ফেলল। এত সুন্দর লাগল মেয়েটার হাসিমুখ। আজ আবার শাড়ি পরেছে। ছাপা শাড়ি। পরীর মত লাগছে দেখতে। আল্লাহতালা মেয়েগুলিকে এত সুন্দর করে পাঠিয়েছেন কেন কে জানে। মেয়েদের সবই সুন্দর। এরা রাগ করলেও ভাল লাগে, অপমান করলেও ভাল লাগে। ভালবাসার কথা বললে কেমন লাগবে কে জানে। এ্যানার মুখ থেকে ভালবাসার একটা কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

বলুন কি বলবেন?

আমি নিজে চায়ের দোকান দিচ্ছি। ভেরি সুন।

খুব ভাল।

নাম একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। এখনো ফাইন্যাল করিনি। নাম হচ্ছে–এ্যানা টি স্টল।

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়েছিল। হঠাৎ হাসি এসে যাওয়ায় বিষম খেল। হীরু অপ্রস্তুত গলায় বলল, হাসির কি হল?

কিছু হয়নি, এমনি হাসছি।

পীর সাহেবের কথামত দিচ্ছি। পীর সাহেব বলে দিলেন।

চায়ের দোকান দিতে বললেন।

হুঁ।

পীর সাহেবের কথা ছাড়া আপনি কিছুই করেন না?

না।

তাহলে উনার কাছে আমি একদিন যাব।

হীরু উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহটা প্রকাশ করল না। মেয়েটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে পারল না। ঠাট্টা হবারই সম্ভাবনা।

উনার কাছে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে যেতে হবে তাই না?

হুঁ। টাকা-পয়সা নেন না। টাকা-পয়সা উনার কাছে তেজপাতা।

দিনে ক প্যাকেট সিগারেট পান?

অনেক। ত্রিশ চল্লিশ, পঞ্চাশ।

একটা মানুষ কি এত সিগারেট খেতে পারে?

হীরু সাবধান হয়ে গেল। প্রশ্ন কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারল না। এই মেয়ে বড়ই ধুরন্ধর। এই মেয়েকে বিয়ে করলেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

এ্যানা বলল, আপনার পীর সাহেব ঐ সব সিগারেট বাজারে বেচে দেয়। এখন বুঝলেন ব্যাপারটা? পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট একটা লোক খেতে পারে না, তাই না?

পীর-ফকির সম্পর্কে সাবধানে কথা বলবে এ্যানা। কখন ফট করে বরদোয়া লেগে যাবে।

লাগুক।

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। হীরুর বুক ছাঁৎ করে উঠল। এখন নিশ্চয়ই চলে যাবে। ইস আরো কিছুক্ষণ যদি আটকে রাখা যেত!

এ্যানা গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। তারও সম্ভবত রুগ্ন মায়ের পাশে সারাক্ষণ থাকতে ভাল লাগে না।

আপনার চায়ের দোকান কবে স্টার্ট হচ্ছে?

শিগগির–ক্যাপিটালের অভাবে আটকা পড়ে আছে। হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ধাঁ করে বেরিয়ে যেতাম।

টাকাটা জোগাড় হচ্ছে না?

হয়ে যাবে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন। ঐ নিয়ে চিন্তা করি না।

আপনি এত বোকা কেন?

হীরু আহত চোখে তাকিয়ে রইল। রাগ হবার কথা। কিন্তু রাগ লাগছে না। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এ্যানা বোধ হয় ব্যাপারটা টের পেল। সে কোমল গলায় বলল, আরেক কাপ চা খাব।

হীরুর মন খারাপ ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। সে মনে মনে বলল অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ। এই মেয়ে পাশে থাকলে চোখ বন্ধ করে সমুদ্রে ঝাপ দেয়া যায়। বাঘের মুখের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি কথা?

আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?

কি বলছ এই সব।

মার খুব ইচ্ছা। মরবার আগে বিয়ে দেখতে চায়।

তোমার বড় বোনেরই তো বিয়ে হয়নি?

ওদের সম্বন্ধ আসে না। আমার এসেছে। ছেলে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করে। অফিসার। বড় অফিসার। আগে একটা বিয়ে করেছিল। বউ মরে গেছে। ছেলেপুলে কিছু নেই।

এইসব পাগলামী চিন্তা একদম করবে না। স্টপ। কমপ্লিট সটপ।

এ্যানা তরল গলায় বলল, কষ্ট করতে ভাল লাগে না। বড়লোকের বউ হতে ইচ্ছা করে। রোজ গাড়ি করে ঘুরব। আমি এখন যাচ্ছি। মার বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে আমাকে না। দেখলে পাগলের মত হয়ে যাবে।

বিয়ের ব্যাপারটা ঠাট্টা না সত্যি?

ঠাট্টা ভাবলে ঠাট্টা। সত্যি ভাবলে সত্যি।

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছল। হীরুর দিকে না তাকিয়ে বলল,–যাই। হীরু কিছুই বলতে পারল না। তার মনে হল সে ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। যতটা বাতাস তার দুই ফুসফুসের জন্যে দরকার ততটা বাতাস এখন নেই। চায়ের বুড়ো দোকানদারের সামনে হীরু দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। তার কেবলি মনে হচ্ছে এক্ষুণি এ্যানা নেমে এসে বলবে–আপনার সঙ্গে তামাশা করছিলাম। আপনি এমন বোকা কেন? মেয়েদের কোন কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই–বুঝলেন সাহেব।

এক ঘণ্টা পার হল, এ্যানা নামল না। হীরুর মনে হল নির্ঘাত মার ঘুম ভেঙে গেছে! মাকে খাইয়ে টাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর নামবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত এগারোটা বাজল। এ্যানা নামল না।

চায়ের দোকানদার এক সময় বলল, আর কত চা খাইবেন? বাড়িত যান–চা বেশি খাওয়া ঠিক না। ভাইজান আপনের চা হইছে তেরটা। আপনের এগারোটা আপার দুইটা। তের টাকা পাওনা।

হীরু টাকা বের করে দিল। হাসপাতালের গেট পার হয়ে খোলা রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন রিকশাওয়ালা বলল, স্যার ভাড়া যাবেন? সে বিনা বাক্যব্যয়ে রিকশায় উঠে বসল। পরীক্ষণেই নরম গলায় বলল, না। আমি যাব না। ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না। এক্সকিউজ করে দেন।

রিকশায় উঠেই তার মনে হয়েছে, এ্যানা নেমে এসে তাকে না দেখে ফিরে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, এ্যানার মার যদি এই রাতে ভালমন্দ কিছু হয় তাহলে তো বেচারী বিরাট প্রবলেমে পড়বে। এ্যানা তাকে যাই বলুক রাতটা তার থেকে যাওয়াই উচিত।

হীরু দ্বিতীয়বারে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে পারল না। কলাপসেবল গেট অবশ্যি খোলা। দু'জন দারোয়ান সেখানে বসে আছে। তারা পাস না দেখে কাউকে ছাড়বে না। রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ডিউটিতে আছেন। তিনি খুবই কড়া লোক। পাস ছাড়া কাউকে দেখলে তাদের না-কী চাকরি চলে যাবে।

হীরু রাত একটার দিকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল। সারা পথ প্রতিজ্ঞা করতে করতে এল– এই জীবনে মেয়েছেলের সঙ্গে সে কোনো কথা বলবে না। মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে কাঁচা গু খাওয়া ভাল।

অরু বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে বসল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অরুর চোখ। আবার ভিজে উঠতে শুরু করল। বড় খারাপ লাগছে। সুমনের জন্যে বুকের মাঝখানে সন্ধ্যা থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছিল সেই যন্ত্রণা এখন তীব্র হয়ে তাকে অভিভূত করে দিচ্ছে।

সুমনের বয়স তিন। এই বয়সেই সে সব কথা বলতে পারে। তিনটা ছড়া জানে। তাল গাছ ছড়াটা বলার সময় কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো ছড়াটা সে এক পায়ে

দাঁড়িয়ে বলতে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত অবশ্যি পারে না। ধুপ করে পড়ে যায়। তখন ছলোছলো চোখে বলে–আম্মা, তালগাছ ব্যথা দেয়।

অরুকে তখন বলতে হয়–আহারে ময়না সোনা।

দিনের মধ্যে কতবার যে ধূপ করে এসে তার কোলে বসবে মিষ্টি মিষ্টি গলায় বলবে, আদর খাও আম্মা। আদর খাও।

তখন অরুকে হামহুম করে আদর খাওয়ার ভঙ্গি করতে হয়। আর হেসে লুটুপুটি খায় সুমন। হাসির মধ্যেই সুমন বলে, আরো আদর খাও আম্মা। আরো খাও।

তুমি বড় বিরক্ত করছ, সোনামণি। এখন যাও খেলা কর।

না। আম্মা তুমি আদর খাও।

সুমনের ছোট হল রিমন। বয়স দেড় বছর। এমন শান্ত বাচ্চা এ পৃথিবীতে আর জন্মেছে বলে অরুর মনে হয় না। ক্ষিধে পেলেও কাঁদবে না। মুখে চুকচুক শব্দ করতে থাকবে। একবার খাইয়ে দিলে হাত-পা এলিয়ে ঘুমুবে কিংবা নিজের মনে খেলা করবে।

বিছানায় চারজনের একসঙ্গে জায়গা হয় না। সুমন ঘুমায় তার দাদীর সঙ্গে। রাতের বেলা চুপিচুপি উঠে এসে অরুর পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে। এক'দিন দু'দিন না, এই কাণ্ড হয় রোজ রাতে। আজ বেচারা কার সঙ্গে ঘুমিয়েছে? ঘুম ভেঙে সে কী অরুকে খুঁজছে না?

অরুর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল।

তিথি এসে অরুর সামনে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, আপা।

অরু চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। সে কান্না থামাতে চেষ্টা করছে, পারছে না। কান্না বন্যার জলের মত। বাঁধ দিতে চেষ্টা করলেই যেন বড় বেশি ফুলে ওঠে।

এস আপা বিছানায় শুয়ে গল্প করি।

অরু ধরা গলায় বলল, সুমনের জন্যে মনটা ভেঙে যাচ্ছে রে তিথি।

খুব বেশি খারাপ লাগলে ফিরে যাও।

না-রে ফিরে যাওয়া যাবে না।

এখানে তুমি যে কষ্ট পাবে তারচে বেশি কষ্ট কী দুলাভাইয়ের ওখানে? ওখানে তো তোমার সুমন, রিমন আছে। এখানে কে আছে? আমরা তোমার কেউ না আপা। এস ঘুমুতে এস।

অরু উঠে এল, এখন সে শান্ত। এখন আর কাঁদছে না। কাঁদারও হয়ত সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করার পর কেউ কাঁদতে পারে না। সে শুয়েছে তিথির সঙ্গে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে বসে। খাট থেকে নেমে বারান্দায় যায়, জলচৌকির উপর গিয়ে বসে। তিথি এক সময় বলল, বড় বিরক্ত করছি আপা।

ঘুম আসছে না।

চুপচাপ শুয়ে থাক। ছটফট করে লাভ হবে কিছু?

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, এখানে এসে ভুল করেছি। তাই না?

ভুল করেছ কি শুদ্ধ করেছ তা জানি না। কোনটা ভুল কোনটা ভুল না, তা এখন আব্বা আমি জানি না।

তোরা সবাই বদলে গেছিস।

তিথি তরল গলায় হেসে উঠল। অরু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, হাসছিস কেন?

সিরিয়াস সিরিয়াস সময়ে আমার কেন জানি হাসি আসে।

তোর সম্পর্কে যে সব শুনি সেগুলি কী সত্যি?

কি শোন?

অরু চুপ করে রইল। তিথি বলল, মুখে আনতে লজ্জা লাগছে, তাই না? তোমার কী আমার সঙ্গে ঘুমুতে এখন ঘেন্না লাগছে? ঘেন্না লাগলে মায়ের সঙ্গে ঘুমাও।

যা শুনছি সবই তাহলে সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

বলতে তোর লজ্জা লাগল না।

না।

আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যেতাম।

না মরতে না। এই যে এত যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে তুমি যাচ্ছ তুমি কী গলায় দড়ি দিয়েছ? দাওনি। বাঁচার চেষ্টা করছ। করছ না?

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, বাচ্চা দুটার জন্যে বেঁচে আছি। নয়ত কবেই...

তিথি আবার হেসে উঠল। অরু বলল, হাসিস না।

আচ্ছা যাও হাসব না। তুমিও ঘুমুবার চেষ্টা কর।

ঘুম আসছে না।

আমার কাছে ঘুমের অষুধ আছে, খাবে? মাঝে মাঝে আমি খাই। দু'টা আস্ত বোতল আছে এককটাতে বত্রিশটা করে ট্যাবলেট–এর পনেরটা খেলেই ঘুম হবে খুবই আনন্দের। খাবে আপা?

অরু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঠাট্টা করছিস তিথি? আমার এই অবস্থায় তুই ঠাট্টা করতে পারিস?

হ্যাঁ পারি। আমি যে কী পরিমাণ বদলে গেছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

তুই আমাকে ফিরে যেতে বলছিল?

বলছি।

একটা ব্যাপার শুধু তোকে বলি তার পরেও যদি তোর মনে হয় আমার চলে যাওয়াই ভাল, আমি চলে যাব।

বেশ তো বল।

অরু কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তিথি বলল, বলতে যদি তোমার খারাপ লাগে তাহলে বলার দরকার নেই।

খারাপ লাগবে না, তুই শোন কোন-একজনকে বলার দরকার। কাকে বলব বল? আমার বলার লোক নেই।

অরু খানিকক্ষণের জন্যে থামল। তারপর নিচু গলায় বলতে লাগল–তোর দুলাভাই যে খুব নামাজী মানুষ তা তো তুই জানিস। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তাহাজ্জুত পড়ে। রোজ ভোরবেলা আধঘণ্টা কুরআন শরীফ পড়ে।

রাতের বেলা সে কখনো স্বামী-স্ত্রীর ঐ ব্যাপারটায় যাবে না। কারণ তাতে তার শরীর অপবিত্র হবে। গোসল করতে হবে, নয়ত ফজরের নামাজ হবে না। কাজেই সে ফজরের নামাজ শেষ করে কুরআন শরীফ পড়া শেষ করে আমার ঘুম ভাঙাবে। দিনের পর দিন

এই যন্ত্রণা। শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে কী প্রেম-ভালবাসা থাকতে নেই? তুই কী আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছিস তিথি?

পারছি।

আরো শুনবি?

না।

তিথি দু'হাতে বোনকে জড়িয়ে ধরল। দু'জন দীর্ঘ সময় বসে রইল চুপচাপ। এক সময় অরু বলল, বাচ্চা দুটাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না রে তিথি। আমি কাল সকালে চলে যাব।

তিথি কিছু বলল না। অনেক'দিন পর তার কান্না পাচ্ছে, অনেক অনেক দিন পর।

১৬. অজন্তা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কে?

দরজার পাশ থেকে কে যেন সরে গেল। ফরিদা বললেন, ভেতরে এস অজন্তা। অজন্তা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল। তার গায়ে স্কুলের পোশাক, হাতে বই-খাতা এবং পানির ফ্লাস্ক। বলল, স্কুলে যাচ্ছ? অজন্তা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাকে সে খুব ভয় পায়।

তুমি আরেকটু কাছে আসি তো। তোমাকে ভাল করে দেখি। অজন্তা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ফরিদা বললেন, তুমি আগের চেয়ে একটু লম্বা হয়েছ তাই না?

হুঁ।

কত লম্বা হয়েছ জানো সেটা? মেপেছ কখনো?

না।

তাহলে বুঝলে কী করে লম্বা হয়েছ?

জামাটা ছোট হয়েছে।

তাই তো, জামা ছোট হয়েছে। আজ তোমার বাবাকে বলবে কাপড় কিনে যেন দরজির দোকানে দিয়ে আসে।

আচ্ছা।

তুমি কী স্কুলে যাবার আগে রোজই আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক?

অজন্তা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল।

আমি বেঁচে আছি কিনা তাই দেখ, ঠিক না?

অজন্তা কথা বলল না, মাথাও তুলল না। তার খুব অস্বস্তি লাগছে। মাকে কেন জানি একই সঙ্গে ভয় লাগে এবং ভাল লাগে।

ফরিদা বললেন, আমি আরো মাসখানিক বেঁচে থাকব।

অজন্তা এবার চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে স্পষ্ট শংকার ছায়া। ফরিদা বললেন, তোমাকে আগেভাগে বললাম যাতে মনে মনে তৈরি হতে পার। এখন যাও।

অজন্তা দরজা পর্যন্ত যেতেই ফরিদা বললেন, তোমার বাবাকে বলবে আজ যেন সে তোমাকে স্কুলে দিয়ে বাসায় চলে আসে। তার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। বলবে মনে করে। আর নিচে খটখট শব্দ হচ্ছে কিসের দেখ তো। শব্দ আমার সহ্য হয় না। তবু সবাই মিলে এত শব্দ করে। ফরিদা চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত শ্বাস ফেললেন।

দবির সাহেবের খুব অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। ফরিদা তাকে কী বলতে চায় এটা তিনি ঠিক আঁচ করতে পারছেন না। তিনি মেয়েকে কয়েকবারই জিজ্ঞেস করলেন সে কী বলেছে জরুরি কথা?

অজন্তা বলল, হুঁ।

কী এমন জরুরি কথা তা তো বুঝলাম না।

অজন্তা বলল, বাবা তুমি কী মাকে ভয় পাও?

দবির সাহেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। ভয় পান না। এত বড় মিথ্যা মেয়েকে সরাসরি বলতে পারেন না। তার এই মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী হয়েছে।

অজন্তাকে স্কুলে নামিয়ে চিন্তিতমুখে দবির সাহেব বাসার দিকে রওনা হলেন। তার কেবলি মনে হতে লাগল, ফরিদা নিশ্চয়ই তিথির কথা তুলবে।

তিথি প্রসঙ্গে ফরিদা এখন পর্যন্ত তাকে কিছুই বলেনি। যদিও তিনি নিজ থেকে হড়বড় করে অনেক কিছু বলেছেন। ফরিদা চোখ বড় বড় কবে শুনেছে। কিছুই বলেনি। এটা ফরিদার স্বভাব। কোনো–একটা ঘটনা ঘটে যাবার অনেক দিন পর ফরিদা সেই প্রসঙ্গে কথা বলবে। মনে হয় দীর্ঘদিন সে ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এক সময় স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তখন কথা বলে। আজো কী সে কোনো সিদ্ধান্তে এসেছে?

আসব ফরিদা!

ফরিদা হেসে ফেলে বললেন, আমার ঘরে আসতে তো আগে কখনো অনুমতি নিতে না। আজি নিচ্ছে কেন? এস, বাস। দবির উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, তোমার শরীর কেমন?

ভালই। খুবই ভাল।

দবির উদ্দিন চিন্তিত মুখে ফরিদাকে লক্ষ্য করলেন–আজ তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখে-মুখে অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা। ফরিদা বললেন,

আমি আর মাসখানিক আছি।

কী বললে বুঝলাম না।

আমি আর মাসখানিক তোমাকে বিরক্ত করব তারপর তোমার মুক্তি।

দবির উদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কী যে তুমি বল।

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এখন পর্যন্ত আমি কী কখনো আজেবাজে কথা কিছু বলেছি?

দবির উদ্দিন হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারলেন না। ফরিদা মৃদু হাসলেন। পর মুহূর্তেই হাসি গিলে ফেলে বললেন, কী করে বুঝলাম এক মাস আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

কী করে বুঝলে?

আমার দুই বান্ধবীর কথা তোমাকে বলেছি না? কাল শেষরাতে তারা আমার ঘরে এসেছিল। এসে বসল। আমার পায়ের কাছে। তখন রাত চারটা দশ। আমার মনে আছে, ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘড়ি দেখলাম। ওরা বলল, ফরিদা তোকে ছাড়া আমাদের কেমন জানি একলা লাগে। তুই চলে আয়। আমরা তোকে নিতে এসেছি। আমি বললাম, আমার নিজেরো এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। তোরা এসেছিস ভালই হয়েছে। তবে এখানকার কাজকর্ম গুছিয়ে তারপর যাব। তোরা এক মাস পরে আয়। তারা বলল, আচ্ছা।

দবির উদ্দিন বললেন, এইসব হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষ কত কিছু দেখে, স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক না।

তুমি সব সময় বাজে কথা বল। আমি কী বলছি শোন এটা স্বপ্ন না।

আচ্ছা বেশ, স্বপ্ন না।

আমি আমার মেয়েটার জন্যে চিন্তা করি। আমি মারা যাবার পর সে খুব কষ্টে পড়বে।

কষ্টে পড়বে না। ওকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসি এটা তুমি জানো না।

জানি। জানব না কেন। তুমি অজন্তার নামে এই বাড়িটা লিখে দাও। দলিল-টলিল করবে মিউটেশন করবে। সব ঝামেলা এক মাসের মধ্যে শেষ করবে।

তার কোনো দরকার আছে?

না থাকলে বলছি কেন।

তুমি যা চাও তাই হবে।

ফরিদা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখ মেললেন অনেকক্ষণ পরে। দবির উদ্দিন বললেন, আমি কী এখন চলে যাব? জরুরি কিছু কাজ ছিল।

আর খানিকক্ষণ বাস। তোমাকে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজই বলে ফেলি।

বল।

তিথিকে নিয়ে তুমি যে বের হয়েছিলে এতে আমি রাগ করিনি। মানুষ ফেরেশতা নয়। তুমি দিনের পর দিন একা কাটিয়েছ। শরীরের একটা দাবি তো আছেই। আমি কিছু মনে করি না।

তিথির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আমি...

জানি। তবে কথা বলার বাইরে কিছু হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। এই ব্যাপারটা আমার নিজেরই দেখা উচিত ছিল। দেখতে পারিনি।

দবির উদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, এই প্রসঙ্গটা থাক।

থাকবে কেন? লজ্জা পাচ্ছ?

হুঁ।

লজার কিছু নেই। তুমি তাকে নিয়ে বের হতে যদি লজ্জা না পাও কথা বললো লজ্জা পাবে কেন? তাছাড়া তোমাকে লজ্জা দেবার জনোও বলছি না। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত তাই আলোচনা করছি।

বেশ আলোচনা কর।

দবির উদ্দিন মাথা নিচু করে ফেললেন, ফরিদা এই দৃশ্য দেখে কেন জানি হেসে ফেললেন।

তুমি কী আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিবে? এখন আর নিজে নিজে পাশ ফিরতে পারি না।

দবির উদ্দিন স্ত্রীকে পাশ ফিরিযে দিলেন। ফরিদা বললেন, তুমি যখন লজ্জা পাচ্ছি তখন ঐ প্রসঙ্গ থাক। তোমাকে লজ্জা দিতে ইচ্ছা করছে না। বরং অন্য একটা প্রসঙ্গে কথা বলি।

বল।

আমি সংসারের খরচ থেকে কিছু টাকা আলাদা করে রাখতাম এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো?

জানি।

পরশু হিসাব করলাম। আমার ধারণা ছিল অনেক টাকা হয়েছে। আসলে অনেক হয়নি। অল্পই জমেছে...

তোমার টাকার দরকার থাকলে বল আমি তোমাকে দিচ্ছি।

কথা শেষ করার আগেই তুমি কথা বল কেন? বড় বিবক্ত লাগে। যা বলছিলাম শোন, আমি পরশুদিন দেখি মাত্র এগার হাজার তিনশ তেত্রিশ টাকা জমেছে। এই টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বল তো?

কী করতে চাও?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারলে কী তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম?

অজন্তাকে দিয়ে দাও।

না। ওকে যা দেবার তুমিই দেবে, আমি এই টাকাটা তিথিকে দিতে চাই।

দবির উদ্দিন এই কথায় তেমন বিস্মিত হলেন না। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল ফরিদা এই কাজটিই করবে। তিনি বললেন, ও তোমার টাকা নেবে না।

কেন নেবে না?

তা জানি না। তবে সে যে নেবে না। এইটুকু জানি।

আমারও তাই ধারণা। তবে ও যেন নেয়। সেই ব্যবস্থা সহজেই করা যায়।

কী ভাবে?

আমি মরবার পর তুমি তাকে বল টাকাটা আমি তার জন্যে রেখে গেছি তাহলে সে একটা সমস্যায় পড়বে। জীবিত মানুষের কথা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি মৃত মানুষের কথা পারি না। তাছাড়া আমি তাকে একটা চিঠিও লিখে রেখে যাব। তুমি খুব দামী কিছু কাগজ কিনে এনো তো।

দামী কাগজ লাগবে কেন?

শেষ চিঠিটা দামী কাগজে লিখতে ইচ্ছা করছে।

বেশ, আনব দামী কাগজ। এখন তাহলে উঠি?

না, আরেকটু বস।

ফরিদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। দবির উদ্দিন অস্বস্তি বোধ করছেন তার কাছে ফরিদার দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার চোখ তো এত উজ্জ্বল কখনো ছিল না। ফরিদা বললেন, চিঠিটা লিখব কী করে বল তো? আমি তো হাতই নাড়তে পারি না।

আমি লিখে দেব।

ফরিদা হাসলেন। প্রথমে মৃদু স্বরে, পরক্ষণেই সেই হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দবির উদ্দিন হাসির কারণটা ধরতে পারলেন না। তার কাছে মনে হচ্ছে এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। একজন অসুস্থ মানুষের হাসি।

ফরিদা বললেন, তুমি আমার হাতটা একটু ধর তো, দেখি কী ভাবে হাত ধর।

কী বললে?

আমার হাতটা একটু ধর।

দবির উদ্দিন, ফরিদার হাতে হাত রাখলেন। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর হাত। নীল শিরাগুলি পর্যন্ত ফুটে রয়েছে। ফরিদা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কারণে-অকারণে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি কিছু মনে করো না।

ফরিদার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

১৬. টুকু অরুকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে

টুকু অরুকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে।

যাচ্ছে বাসে। অরু বসার জায়গা পেয়েছে টুকু তার পাশেই হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। অরু বলল, টুকু তুই আমার কোলে বোস।

টুকু খুব লজ্জা পেল। কারো কোলে বসে যাবার বয়স কী আছে? তার বয়স বাড়ছে এই কথাটা কারোরই মনে থাকে না। টুকুর প্যান্টে স্টার সিগারেটের প্যাকেটে তিনটা সিগারেট পর্যন্ত আছে। এই খবর জানতে পারলে আপার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ হবে।

দাউদকান্দিতে পৌঁছবার পর টুকু বসার জায়গা পেল। অরুর পাশের বৃদ্ধ নেমে গেছেন। অরু বলল, তুই জানালার পাশে বসবি টুকু?

না।

আয় না বোস, সুন্দর দেখতে দেখতে যাবি।

তুমি দেখতে দেখতে যাও।

আপার দিকে তাকাতে টুকুর বড় ভাল লাগছে। ফিরে যাবার আনন্দে। আপার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে, কেমন ছটফট করছে। আনন্দে ধরে রাখতে পারছে না।

অরু নিচু গলায় বলল, টুকু তোর কী মনে হয়, আমাদের দেখলে তোর দুলাভাই রাগারগি করবে?

জানি না আপা।

কিছু তো করবেই। পুরুষ মানুষের এমনিতেই রাগ বেশি থাকে। তোকে হয়ত কিছু বকাঝকা দিবে, তুমি কিছুই মনে করিস না।

আমি কিছু মনে করি না।

মনে না করাই ভাল। এত কিছু মনে পুষে রাখলে সংসার চলে না।

কথা বলো না আপা। সবাই শুনছে।

অরু চুপ করে গেল, কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না। ফিসফিস করে বলল–সুসান আমাকে দেখলে কী করবে। আন্দাজ কর তো টুকু?

টুকু জবাব দিল না। অরু বলল, প্রথম এরকম ভান করবে। যে আমাকে চিনতে পারছে না। ওর এই স্বভাব। তার বাবা একবার তিন দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে আসার পর সুমন এমন ভাব করেছে যেন বাবাকে চেনে না। অথচ ঠিকই চিনেছে। রিমন আবার ঠিক তার উল্টো। শব্দ পেলেই ঝাপ দিয়ে কোলে পড়বে।

আপা চুপচাপ বস তো।

রিমনের শার্টটা ছোটই হয়। কিনা কে জানে। সুমনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি কিনেছি। আর রিমনের জন্যে শার্ট। একটু বড় কেনার দরকার ছিল। ওদের কাপড়গুলি তুই দেখেছিস?

না।

দেখবি?

এখন দেখব না আপা। আর তুমি এত কথা বলছ কেন?

কেউ তো আর শুনতে পারছে না, ফিসফিস করে বলছি।

চুপচাপ বসে থাক আপা, ঘুমুবার চেষ্টা কর।

দূর বোকা, বাসে কেউ ঘুমায়?

তারা বাড়িতে পৌঁছল। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে! আব্দুল মতিনের সঙ্গে দেখা হল বাংলাঘরের সামনে। সে মাগরেবের নামাজের জন্যে অজু করছিল। মতিন কড়া গলায় বলল, কে?

টুকু বলল, দুলাভাই আমরা।

আমরা! আমরাটা আবার কে?

আপাকে নিয়ে এসেছি দুলাভাই।

কে আনতে বলেছে?

অরু নিচু গলায় বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবকি করছ, কেন? ঘরে যাই তারপর...

এ দেখি ফড়ফড় করে কথাও বলে।

টুকু বিস্মিত গলায় বলল, এই সব কী বলছেন দুলাভাই?

আব্দুল মতিন খেকিয়ে উঠল, চামচিকা দেখি আমাকে ধমক দেয়। দূর হা হারামজাদা।

টুকু হতভম্ব হয়ে গেল। হৈচৈ শুনে লোকজন জড়ো হয়েছে। ভেতর থেকে অরুর এক মামাশ্বশুর বের হয়েছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। সুমন তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে এবং ভীত চোখে তাকাচ্ছে তার বাবার দিকে। অরু, অসহায় ভঙ্গিতে ছেলের দিকে এগিয়ে গেল! আব্দুল মতিন চেঁচিয়ে উঠল, এই কোথায় যাস তুই, খবরদার।

অরুর চোখে পানি এসে গেছে, সে গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। কী করবে সে? ছুটে গিয়ে তার স্বামীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়বে। কিন্তু এত লোকজন চারদিকে জড়ো হচ্ছে–আহা, যদি কেউ না থাকত। অরু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি এ রকম করছ কেন?

চুপ। চুপ।

বয়স্ক অপরিচিত এক ভদ্রলোক বললেন, ভিতরে নিয়া যান। যা হওনের হইছে। আব্দুল মতিন কঠিন গলায় বলল, যেটা জানেন না সেটা নিয়ে কথা বলবেন না। এর ছোট বোন বেশ্যাবৃত্তি করে এটা জানেন?

অরু জলভরা চোখে টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, চল, চলে যাই।

টুকু বলল, চল।

অরু তার ছেলের দিকে তাকাল। সুমনের চোখে অপরিচিতের দৃষ্টি। যেন মাকে সে চিনতে পারছে না।

টুকু বোনের হাত ধরল। কোমল গলায় বলল, চল আপা; এতগুলি মানুষ তাদের চারপাশে। কেউ কিছুই বলল না।

রাত দু'টায় ঢাকা যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। তারা স্টেশনে বসে রইল। টুকু ভেবেছিল আপা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। দেখা গেল অরু বেশ শক্তই আছে। টুকু বলল, কিছু খাবে আপা?

অরু বলল, টাকা আছে?

আছে কিছু।

টিকিট কাটার তো টাকা লাগবে। ঐ টাকা আছে?

আমার টিকিট লাগবে না। তোমার টিকিটা কাটিব।

তাহলে যা কিছু কিনে আন। খুব ক্ষিধে লেগেছে।

পরোটা ভাজি আনব আপা?

আন।

টুকু পরোটা, আলুভাজি আর কলা নিয়ে এল। অরুণ বেশ আগ্রহ করেই খেল। তার সত্যি সত্যিই খুব ক্ষিধে পেয়েছিল।

আপা।

কী রে?

আমার কী মনে হচ্ছে জানো? আমার মনে হচ্ছে–ওরা আমাদের খোঁজে স্টেশনে আসবে। বাড়িতে মুরুব্বি আছে, তারা যখন শুনবে তখন...

অরু সহজ গলায় বলল, কেউ আসবে না। টুকু, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কী করি বল তো? কয়েক রাত ঘুম হয়নি এখন ঘুমে একেবারে চোখ জড়িয়ে আসছে।

মেয়েদের ওয়েটিং রুমে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমাও। চল যাই।

চল।

লম্বা কাঠের বেঞ্চিতে অরু কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার নিচে হ্যান্ড ব্যাগ। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। টুকু সারাক্ষণই বোনের পাশে বসে রইল। এক সময় দেখল ঘুমের মধ্যেই অরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত টুকুর প্রথম গল্পে এই দৃশ্যটি ছিল। চমৎকার একটি গল্প, যদিও বেশির ভাগ মানুষই এই গল্প পড়ল না। পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক কী মনে করে জানি টুকুকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে অনেক খানি উচ্ছ্বাস ছিল। সাহিত্য সম্পাদকরা কখনো এই জাতীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না।

বাড়ি ফিরেও অরু, তেমন কোনো আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখাল না। মনে হল জীবনের কঠিন বাস্তবকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। একবারও নিজের বাচ্চা দু'টির কথা বলল না। তিথিকে বলল, তুই কী আমার জন্যে কোনো চাকরি-টাকরি জোগাড় করে দিতে পারবি?

তিথি বলল, আমি চাকরি কোথায় পাব আপা?

অরুণ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাও তো ঠিক। যে কোনো ধরনের চাকরি হলেই হয়। আয়ার কাজও করতে পারি। আজকাল তো শুনেছি বড়লোকদের বাড়িতে বেতন দিয়ে আয়া রাখে।

আমি এইসব খোঁজ রাখি না আপা।

পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলে লাভ হবে?

জানি না আপা।

তোর তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা সবাইকে যদি বলে-টলে রাখিস...

আমার সঙ্গে কারোর কোনো জানাশোনা নেই, এইসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না তো আপা।

আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।

দিন পনের পরে আব্দুল মতিনের পক্ষ থেকে উকিলের চিঠি এসে উপস্থিত হল। সেই চিঠির বক্তব্য হচ্ছে আব্দুল মতিন তার স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ তার স্ত্রী নষ্ট চরিত্রের অধিকারী। আব্দুল মতিন স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হয়নি। স্ত্রীর কারণে সে সামাজিকভাবে অপদস্ত হয়েছে। মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারছে না। কাজেই সে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের এবং দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে তার স্ত্রী শাহানা বেগম ওরফে অরুকে ইসলামী বিধি মোতাবেক তালাক দিচ্ছে।

এই চিঠিতেও অরুর কোনো ভাবান্তর হল না। মনে হল সে আগে থেকেই জানত এ ধরনের একটি চিঠি আসবে। মিনু খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

জালালুদ্দিন গম্ভীর হয়ে বললেন, কান্নাকাটি করে লাভ নেই, সবই কপালের লিখন। শুধু বংশের ওপর একটা দাগ পড়ে গেল–এটাই আফসোসের কথা। এত বড় বংশ।

হীরু খুব চোঁচামেচি করতে লাগল, হারামজাদা ভেবেছে কী, হারামজাদাকে আমি হাইকোর্টে নিয়ে তুলব। জেলের ভাত খাওয়াব। জেলের মোটা ভাত পেটে পড়লে বুঝবে লাইফ কাকে বলে। এমনি এমনি ছাড়ব আমি সেই পাত্রই না। কাস্টডি মামলা করব। সুমন, রিমন থাকবে তার মা'র সাথে।

অরু বলল, চেঁচাস না তো–চুপ কর।

চুপ করব কেন? কাস্টডি মামলা করলে বাপ বাপ করে সুমন, রিমনকে দিয়ে যাবে।

ওদের এখানে দিয়ে গেলে লাভ কী হবে? খাওয়াব কী? যেখানে আছে, ভালই আছে। তুই খামোখা চিৎকার করিস না।

তোমার নিজের বাচ্চাদের জন্য তোমার হার্টে কোনো 'লাভ' নেই?

না।

বল কী?

এত গাধা তুই কী করে হলি, বল তো হীরু?

গাধা?

হ্যাঁ গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস।

হীরু মন খারাপ করে বেরিয়ে গেল। মেয়েছেলের মতিগতি বোঝা খুব মুশকিল। ভাল বললে মন্দ বুঝে। কী অদ্ভুত একটা জাত আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন। এই জাতের মুখের দিকে তাকানও উচিত না। নিমক হারাম জাত।

নারী জাতির ওপর হীরুর ভক্তি-শ্রদ্ধা কোনো কালেই বেশি ছিল না। ইদানীং নারী জাতিকে সে সহ্যই করতে পারছে না। কারণ এ্যানার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ্যানার মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মেয়ে বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। শেষপর্যন্ত যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়েছে সে ডাক্তার। প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি করে। চেহারাও ভাল। অপছন্দ করার মত কিছু তার মধ্যে নেই। হীরু খোঁজ নিয়ে জেনেছে। ইতিমধ্যে এ্যানা দু'দিন সেই ডাক্তারের সঙ্গে চাইনিজ খেতে গিয়েছে।

হীরু পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে পীর সাহেবকে ব্যাপারটা বলেছে। পীর সাহেব হাসিমুখে বলেছেন–চিন্তার কিছু নাই রে ব্যাটা। চিন্তার কিছু নাই। সবই আল্লাহর হুকুম।

হীরু বিনীতভাবে বলেছে, আল্লাহর হুকুমটা কী সেটা যদি একটু জেনে দেন। বড় অশান্তিতে আছি।

পীর সাহেব অভয় দেয়া স্বরে বললেন, তোর চিন্তার কিছু নাই।

হীরু এই প্রথম পীর সাহেবের কথায় বিশেষ ভরসা পেল না। ডাক্তার ছেলে, চেহারা ভাল, বয়স অল্প, নারায়ণগঞ্জে বাড়ি আছে–এই ছেলেকে ফেলে এ্যানা আসবে তার কাছে। গাধা

টাইপ মেয়ে হলেও একটা কথা ছিল। এ্যানার মত বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে কী কখনো এই কাজ করবে?

ডাক্তার ছেলেটিকে একটা উড়ো চিঠি পাঠানোর চিন্তা হীরুর মাথায় এসেছিল। সেই উদ্দেশ্যে অনেক ঝামেলা করে নারায়ণগঞ্জের ঠিকানাও জোগাড় করেছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে চিঠির একটা খসড়াও দাঁড় করিয়েছিল।

ডাক্তার সাহেব,
সালাম পর সমাচার এই যে, পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম এ্যানা নামী জনৈকার সহিত আপনার বিবাহ। এক্ষণে আপনাকে জানাইতেছি যে, এই মেয়েটির চরিত্র উত্তম নয়। পাড়ার যে কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা জানিতে পরিবেন। চরিত্র দোষ ছাড়াও এই মেয়েটির মেজাজ অত্যন্ত উগ্র। বিবাহ করিবার আগে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবেন। তাহা যদি না করেন তা হইলে আপনার বাকি জীবন ছারখার হইয়া যাইবে।
ইতি–
আপনার জনৈক বন্ধু।

শেষপর্যন্ত চিঠিটা হীরু পাঠাতে পারল না। এ্যানা সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখতে ইচ্ছা করল না। একটা ভাল মেয়ের নামে বদনাম দেয়াটা ঠিক না। তারচে বরং ছেলেটার নামে কিছু বদনাম এ্যানার কানে উঠিয়ে দিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেক চেষ্টায় সেই সুযোগ পাওয়া গেল। বাস স্টপে এ্যানাকে একা পাওয়া গেল। হীরু হাসি মুখে এগিয়ে গেল।

কী খবর এ্যানা?

এ্যানা সহজ ভঙ্গিতে বলল, কোন খবরটা জানতে চান?

বিয়ে হচ্ছে শুনলাম।

ঠিকই শুনেছেন।

ডেট হয়ে গেছে না-কী?

এখনো হয়নি। তবে শিগগিরই হবে।

ব্যাপারটা নিয়ে একটা সেকেন্ড থট দাও। বিয়ে দু'একদিনের ব্যাপার না। সারা জীবনের ব্যাপার। শেষে আফসোসের সীমা থাকবে না।

এ্যানা হাসি হাসি মুখে বলল, ছেলের চরিত্র খুব খারাপ তাই না?

হীরু খানিকটা হকচাকিয়ে গেল। যে কথা তার নিজের বলার কথা সেই কথা এ্যানা বলে ফেলায় গুছিয়ে রাখা কথাবার্তা সব এলোমেলো হয়ে গেল।

এ্যানা বলল, আপনি কী ভেবেছেন ছেলেটার চরিত্র খারাপ শোনামাত্র আমি বিয়ে ভেঙে দেব?

কবে নাগাদ হবে বিয়েটা?

বললাম তো এখনো ডেট হয়নি। ডেট হলে আপনাকে জানাব।

তোমার রেজাল্ট কবে হবে?

রেজাল্ট তো গত সপ্তাহেই হল। আপনার পীর সাহেবের খবর ছাড়া আপনি দেখি আর কোনো খবরই রাখেন না।

পাস করেছ?

হ্যাঁ। ফাস্ট ডিভিশন, চারটা লেটার।

ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা করব কেন? আপনি কী আমার দুলাভাই?

হীরু এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। কথাবার্তা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল দেখায় না। অথচ কোনো কথাই মনে আসছে না।

কোন কলেজে ভর্তি হবে?

জানি না। ও যেখানে ভর্তি করায়।

কী পড়বে?

আইএসসি পাস করে ডাক্তারি পড়ব। স্বামী-স্ত্রী দু'জন ডাক্তার হলে খুব ভাল হয়।

হীরু মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনটা ক্রমেই বেশি খারাপ হয়ে, যাচ্ছে। এই মেয়ে জাতটা বড় অদ্ভুত। কী বললে পুরুষ মানুষের মন ভাল হয় সেটা যেমন জানে আবার কী বললে পুরুষ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায় সেটাও জানে।

বাস এসে গেল। এ্যানা বাসের দিকে এগুতে এগুতে অবলীলায় বলল, বিয়েতে আসবেন কিন্তু। রাগ করে বাসায় বসে থাকবেন না।

এ্যানা বাসে উঠে গেল।

হীরু হতভম্ব হয়ে লক্ষ্য করল তার চোখে পানি এসে গেছে। কী লজ্জার কথা! সে একজন পুরুষ মানুষ আর তার চোখে কি-না পানি? সম্ভবত এটা কেয়ামতের নিশানা। পীর সাহেব একবার বলেছিলেন–কেয়ামত যত কাছে আসবে উল্টাপাল্টা ব্যাপার ততই বেশি হতে থাকবে। মেয়েছেলে হবে পুরুষের মত তাদের দাড়ি-গোঁফ গজাবে, হায়েজ-নেফাস হবে বন্ধ। আর পুরুষ হবে মেয়েদের মত। পুরুষদের দাড়ি উঠবে না। প্রতি মাসে কয়েক দিন তাদের লিঙ্গ দিয়ে দুষিত রক্ত বের হবে। ওহ আল্লাহতালার কী কুদরত! বলেন–ইয়া নবী সালাম আলায় কা...

১৭. তিথি নাসিমুদ্দিনের কাছে এসেছে

অনেক'দিন পর তিথি, নাসিমুদ্দিনের কাছে এসেছে। নাসিম দরজা খুলে অবাক, আরে তুমি?

তিথি নিচু গলায় বলল, কেমন আছেন নাসিম ভাই? শরীর এমন কাহিল লাগছে কেন?

ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল। প্রতি বছর শীতের শুরুতে এরকম হয়। জ্বরজ্বারি। এবার খুব বেশি হয়েছে। এস ভেতরে এস।

তিথি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ভাবী বাসায় নেই?

না, বাপের বাড়ি গেছে। ছেলেপুলে হবে।

আবার?

নাসিম লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, তুমি অনেক'দিন আস না দেখে ভাবলাম তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিয়ে-শাদী করে সংসার পেতেছ। এ রকম হয়। চিরকাল তো আর খারাপ যায় না।

কারোর কারোর আবার যায়।

তোমাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেয়েদের এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না।–আর আমিই কি-না এর দালালি করি।

কেন করেন?

অভাব, বুঝলে তিথি–অভাব। প্রথম যখন এই রকম দালালি করলাম তখন মনের অবস্থাটা কী হয়েছে শোন–তিনশ টাকা পেয়েছি। টাকাটা বাসায় নিয়ে আসলাম। রাত তখন এগারটা, ঝুম

বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যে....

বৃষ্টির মধ্যে কী?

বাদ দাও। ঐ সব বলে কী হবে। আমি এই লাইন ছেড়ে দিব তিথি। মীরপুরে একটা দোকান নিচ্ছি টেইলারিং শপ।

দরজির কাজ আপনি জানেন?

না জানি না। কারিগর রাখব। নিজে শিখে নিব।

ভালই তো। কিন্তু আমাদের মত মেয়েদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো সেই পথে পথেই ঘুরব। আপনার মত একজন ভাল মানুষ পাশে থাকলে মনে সাহস থাকে।

ভালমানুষ। আমি ভালমানুষ? এই কথা না বলে স্যান্ডেল খুলে তুমি আমার গায়ে একটা বাড়ি দিলে না কেন? তাহলেও তো কষ্ট কম পেতাম। চা খাবে?

না।

খাও একটু চা। তোমার উপলক্ষে আমিও এক ফোঁটা খাই।

রান্নাবান্না নিজেই করেন?

হ্যাঁ। চারটা ডালভাত খাবে আমার সাথে?

জি-না।

নাসিম রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিল। তিথি পেছনে পেছনে গেল। নাসিম বলল, তুমি কী কাজের সন্ধানে এসেছে?

একটা কাজ হাতে আছে। কোরিয়া থেকে তিনজনের একটা টিম এসেছে। জয়েন্ট ভেনচারে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি খুলবে। ওদরে খুশি করবার জন্যে বাংলাদেশী পার্টনাররা উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের তিনজনের জন্যে তারা তিনজন বান্ধবী চায়। এরা তাদের সাথে ঘুরবে। রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার এই সব জায়গায় যাবে, চার-পাঁচদিনের ব্যাপার। তুমি যাবে?

তিথি জবাব দিল না।

নাসিম বলল, টাকা-পয়সা ভালই পাবে। ওদের সঙ্গে ঘুরলে মনটাও হয়ত ভাল থাকবে।

তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মন ভাল থাকবে?

এমনি বললাম তিথি। কথার কথা। নাও-চা নাও।

তিথি নিঃশব্দে চায়ের কাঁপে চুমুক দিতে লাগল। নাসিম বলল, তুমি যদি যেতে চাও তাহলে ১১ তারিখের মধ্যে জানাবে। ওরা ১২ তারিখ রওনা হবে।

টাকা কেমন দেবে জানেন?

না। হাজার পাচেক তো পাবেই।

আজ তাহলে উঠি নাসিম ভাই?

এস তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, যাবে কোথায়? বাসায় তো?

হ্যাঁ।

চল।

নাসিমুদিন তাকে উঠিয়ে দিল। জোর করে হাতে একশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। বাস ছেড়ে না-দেয়া পর্যন্ত বাস স্টপে দাঁড়িয়ে রইল।

জালালুদ্দিন সাহেব খুবই আদরের সঙ্গে বললেন, জনাব আপনার নাম এবং পরিচয়? ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম দবির উদ্দিন। আগেও একবার এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে

দেখা হয়েছিল। কিছুই মনে থাকে না ভাই সাহেব। চোখে না দেখরে মনে থাকবে কী ভাবে বলেন? দৃষ্টিশক্তি নেই। সামান্য চিকিৎসায় আরাম হয়। সেটাই কেউ করাচ্ছে না। বসুন ভাই।

আমি আপনার মেয়ের কাছে এসেছিলাম, তিথি।

তিথি বাসায় নেই। এসে পড়বে। একটু বসেন। সুখ-দুঃখের কথা বলি, আপনের দেশ কোথায়? দবির উদ্দিন তার দেশ কোথায় সেই প্রসঙ্গে গেলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম।

সত্যি? জি, এই নিন।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে জালালুদ্দিন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পৃথিবীতে এখনো এত ভালমানুষ আছে?

ভাই সাহেব বড়ই খুশি হলাম। বসুন। একটু চায়ের কথা বলে আসি।। দিবে কী না বলতে পারছি না। আপনি বন্ধু মানুষ, আপনাকে বলতে বাধা নেই। এই সংসারে আমি কুকুর-বিড়ালের অধম। বিড়াল যদি একবার ম্যাও করে–তার সামনে একটা কাটা ফেলে দেয়। আমার বেলায় তাও না।

জালালুদ্দিন সাহেব চায়ের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মিনু চায়ের কথা শুনে এমন এক ধমক দিলেন যে জালালুদ্দিন সাহেবের মনে হল সংসারে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এরচে রাস্তায় ভিক্ষা করা এবং রাতে কমলাপুর রেলস্টেশনে শুয়ে থাকা অনেক ভাল। শেষপর্যন্ত হয়ত তাই করতে হবে। এমন বিশিষ্ট একজন মেহমান। অথচ তাকে এক কাপ চা খাওয়ানো যাচ্ছে না। এরচে আফসোসের ব্যাপার। আর কী হতে পারে?

ভাই সাহেব নিজগুণে ক্ষমা করবেন। চা খাওয়াতে পারলাম না।

ঐ নিয়ে চিন্তা করবেন না। তিথি কখন আসবে বলে আপনার মনে হয়?

কিছুই বলতে পারছি না ভাই সাহেব। এই সংসারের কোনো নিয়ম-কানুন নাই। যার যখন ইচ্ছা আসে। যখন ইচ্ছা যায়। সরাইখানারও কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। এই বাড়ির তাও নাই।

আমার খুবই জরুরি কাজ আছে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি আপনার কাছে কী একটা প্যাকেট রেখে যাব–তিথিকে দেবার জন্যে।

রেখে যান।

আপনার মনে থাকবে তো? ভুলে যাবেন না তো আবার?

জি-না ভুলব না।

প্যাকেটের ভেতর একটা জরুরি চিঠি ও আছে।

আমি দিয়ে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। আসামাত্র দিয়ে দেব।

আজ তাহলে উঠি।

কোন মুখে আর আপনাকে বসতে বলি? এক কাপ চা পর্যন্ত দিতে পারলাম না। বড়ই শরমিন্দা হয়েছি ভাই সাহেব! নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

দবির উদ্দিনের চিঠিটি দীর্ঘ এবং সুন্দর করে লেখা। চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। ভদ্রলোক বেশ সময় নিয়ে লিখেছেন। ঠিকঠাক করেছেন। একটা রাফ কপি করবার পর আবার ফেয়ার কপি করা হয়েছে কারণ চিঠিতে কোনো রকম কাটাকুটি নেই।

তিথি খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল। অনেক দিন পর কেউ তাকে চিঠি লিখল। তাও এমন গুছিয়ে লেখা চিঠি।

প্রিয় তিথি, একটা দুঃসংবাদ দিয়ে চিঠি শুরু করছি। আমার স্ত্রী ফরিদা মারা গেছে। এই মাসের ১৮ তারিখে। সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুর সময় আমি তার পাশে ছিলাম। সে আমাকে বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। মনে কোনো রাগ রেখো না। তার মৃত্যু খুব সহজ হয়নি। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হল। এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এই প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও সে হাসি হাসি মুখ হয়ে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কষ্ট শেষ হবে ভাবতেই আনন্দ লাগছে।

ফরিদা তোমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছে। আশা করি মৃত মানুষের প্রতি সম্মান দেখিয়ে টাকাটা তুমি গ্রহণ করবে। টাকার পরিমাণ তেমন কিছু না। তবে প্রতিটি টাকাই ফরিদার। সে কোন এক বিচিত্র কারণে তোমাকে পছন্দ করেছে। ফরিদার ঘৃণা এবং ভালবাসা দুইই খুব তীব্র।

ফরিদার মৃত্যুর পর বুঝলাম তাকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসতাম। আজ আমার দুঃখ ও বেদনার কোনো সীমা নেই।

অজন্তা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তবু এই কষ্টের মধ্যেও আমার কষ্টটা তার বুকে বাজছে। সে তার নিজের মতো করে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যটিও মধুর।

তিথি এই মধুর দৃশ্যটি কী তুমি এসে দেখে যাবে? যদি এই দৃশ্য তোমার ভাল লাগে তাহলে তুমি এসে যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শুরুর জীবনটা কষ্টের ছিল, শেষেরটা মধুর হতে ক্ষতি কী? এস ধরে নেই যে, আমাদের কারোর কোনো অতীত ছিল না। যা আমাদের আছে তা হচ্ছে বর্তমান।

তিথি, এককালে আমি খুব গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারতাম। আমি খুব চেষ্টা করছি এই চিঠিটিও গুছিয়ে লিখতে। পারছি না। তবে মনে মনে অপূর্ব একটি চিঠি তোমার কাছে এই মুহূর্তে লিখছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই চিঠি কোনো না কোনো ভাবে তোমার কাছে পৌঁছবে।

তিথির চোখ ভিজে উঠল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য এখনো আমার চোখে পানি আসে।

তিথি।

তিথি দেখল হীরু দরজা ধরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোনো কারণে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তিথি শুকনো গলায় বলল, কী ব্যাপার?

একটু বাইরে আয়।

যা বলার এখানে বললেই হয়।

না, একটু বাইরে আয়।

তিথি উঠোনে এসে দাঁড়াল। হীরু নিচু গলায় বলল, সর্ব্বনাশ হয়েছে রে তিথি। ভেরি বিগ প্রবলেম।

প্রবলেমটা কী?

এ্যান চলে এসেছে।

এ্যানা চলে এসেছে মানে? এ্যানাটা কে?

বলেছিলাম না একটা মেয়ের কথা, আমার সঙ্গে ইয়ে আছে। আজ সকালেই তার গায়ে হলুদ হয়েছে। আর এখন এই সন্ধ্যাবেলা কী গ্রেট ঝামেলা, এক কাপড়ে চলে এসেছে।

চলে এসেছে মানে? তোর কাছে কী ব্যাপার?

আহ্ কী যন্ত্রণা আমাদের মধ্যে একটা Love চলছে না; এখন করি কী বল?

মেয়েটা কোথায়?

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কী যে প্রবলেমে পড়লাম। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াই তো ভাল। কী বলিস তিথি?

তিথি বিস্মিত হয়ে বাইরে এসে দেখল, কাঁঠাল গাছের অন্ধকারে হলুদ শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে?

এ্যানা সহজ গলায় বলল, আপা আমি এ্যানা।

তুমি এইসব কী পাগলামি করছ? বাসায় যাও। চল আমি তোমাকে দিয়ে আসি।

বাসায় ফিরে যাবার জন্যে তো আসিনি আপা।

তুমি বিরাট বড় একটা ভুল করছি এ্যানা।

জানি আপা।

আমার তো মনে হয় না তুমি জানো। আমার ভাইকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ওর জন্যে তুমি এত বড় ডিসিশান নিতে পার না।

হীরু শুকনো মুখে বলল, তিথি রাইট কথা বলছে। ভেরি রাইট এবং ওয়াইজ কথা।

এ্যানা বিরক্তমুখে বলল, তোমাকে কত বার বলেছি কথার মধ্যে মধ্যে বিশ্রী ভাবে ইংরেজি বলবে না।

এই প্রথম এ্যানা হীরুকে তুমি করে বলল। হীরুর বুক কেমন ধড়ফড় করতে লাগল। চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায়? মেয়েটাকে খুশি করবার জন্যে সে অনেক কিছু করতে পারে। হাসিমুখে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ডান হাতটা কেটে পানিতে ফেলে দিতে পারে।

তিথি বলল, এখনো সময় আছে এ্যানা। এখনো সময় আছে।

এ্যানা মিষ্টি করে হাসল। মেয়েটা দেখতে তত সুন্দর না। কিন্তু তার হাসিটি বড়ই স্নিগ্ধ। তিথি বলল, এখন যে কত রকম ঝামেলা হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছি না। তোমার বাবা পুলিশে খবর দেবেন। পুলিশ আসবে, তোমাকে এবং হীরুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাব। এ্যানা বলল,

এইসব কিছুই হবে না আপা। আমি বাসায় না বলে তো আসিনি। বলেই এসেছি। সবাই জানে ভূমিকাথায়। কেউ কোনো ঝামেলা করবে না। কারণ আমি তাদের এমন একটা কথা বলে এসেছি...

কথা শেষ না করেই এ্যানা হাসল। তিথি বলল, কী কথা বলে এসেছ?

এটা আপা বলা যাবে না।

এস ঘরে এস।

এ্যানা জালালুদ্দিন সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল। জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, কে? এ্যানা বলল, বাবা আমার নাম এ্যানা। আমি আপনার একজন মেয়ে।

জালালুদ্দিন হকচকিয়ে গেলেন। কী ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, মা আপনার শরীর কেমন?

এ্যানা বলল, আমার শরীর ভাল।

মিনুকে সালাম করতে যেতেই মিনু বললেন, খবরদার তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।

এ্যানা সহজ গলায় বলল, আমার সঙ্গে এমন কঠিন করে কথা বললে তো হবে না মা। আমি এই বাড়িতেই থাকব। আমাদের তো মিলেমিশে থাকতে হবে। হবে না?

রাত সাড়ে দশটায় কাজী এনে বিয়ে পড়ানো হল। এ্যানার বাবাকে খবর দেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার–তিনি বিয়েতে এলেন। হীরু যখন তাকে সালাম করল তখন হীরুকে একটা আংটি এবং দুশ টাকা দিলেন।

টাকাটা পাওয়ায় হীরুর খুব লাভ হল। তার হাতে একটা পয়সা ছিল না। কেন জানি তার মনে হল এ্যানা খুব পয়মন্ত মেয়ে। এইবার সংসারের হাল ফিরবে।

১৮. এ্যানা টি স্টল

হীরুর খুব ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের নাম রাখবে এ্যানা টি স্টল। এ্যানার কারণে তা হল না। এ্যানা কঠিন গলায় বলল, ফাজলামি করবে না তো। ফাজলামি করলে চড় খাবে। হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, চড় খাব মানে? এটা কী ধরনের কথা! ওয়াইফ হয়ে হাসবেন্ডকে চড় দেয়ার কথা বলছি। সান কী আজ পূর্বদিকে রাইজ করল?

হ্যাঁ, করল। চায়ের দোকানের কোনো নাম লাগবে না।

একটা দোকান দেব তার নাম থাকবে না?

না। পাঁচ পয়সা দামের দোকান তার আবার নাম।

পাঁচ পয়সা দামের দোকান মানে? নগদ চার হাজার সাতশ টাকা নিজের পকেট থেকে দিলাম।

নিজের পকেট থেকে তুমি একটা পয়সাও দাওনি। তিথি আপা টাকাটা দিয়েছে।

একই হল।

না একই হয়নি। এখন যাও–যথেষ্ট বকবক করেছ।

হীরু মন খারাপ করে বের হয়ে এল। তার এখন সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে এই মেয়েকে বিয়ে করে গ্রেট ভুল করা হয়েছে। এই মেয়ে তার জীবনটা ভাজা ভাজা করে ফেলবে। দিনরাত ঝগড়া করবে। ঘরের চালে কাক-পক্ষী বসতে দেবে না।

মিনুর সঙ্গে এ্যানার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়ে গেল। তিন দিন না পেরুবার আগেই। এ্যানা রান্নাঘরে ভাত বসিয়েছে। মিনু বললেন–কী করছ?

ভাত বসিয়েছি। তোমাকে ভাত বসাতে বলেছি? না, বলেননি। বলতে হবে কেন? আপনার কী ধারণা আমি ভাত রাঁধতে জানি না?

মিনু স্তম্ভিত গলায় বললেন, এ রকম করে কথা বলা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

কেউ শেখায়নি। ভাত বসিয়েছি তা নিয়ে আপনিই বা এত হৈচৈ করছেন কেন?

মিনু চাপা গলায় বললেন, তুমি তো ভয়ংকর বদ মেয়ে।

এ্যানা সহজ স্বরে বলল, আমি বদ মেয়ে না। আপনার ছেলেটা বদ। আপনার ছেলের ভাগ্য ভাল যে আমি তাকে বিয়ে করেছি।

মেয়েটির গালে প্রচণ্ড একটা বড় চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা মিনু অনেক কষ্টে দমন করলেন। নতুন বউয়ের গায়ে এত তাড়াতাড়ি হাত তোলা ঠিক হবে না। তাছাড়া ছেলের বউকে শায়েস্তা করতে হয় ছেলেকে দিয়ে। তিনিও তাই করবেন।

জালালুদ্দিন এ্যানাকে বেশ পছন্দ করলেন। তেজী মেয়ে। এই সংসারের জন্যে এ রকম তেজী মেয়েই দরকার। মেয়েটির সঙ্গে খাতির রাখলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে–এই ধারণা নিয়ে তিনি ভাব জমানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। মধুর স্বরে যখন-তখন ডাকেন–মা এ্যানা, একটু শুনে যাও তো। এ্যানা সঙ্গে সঙ্গে এসে পুরুষালী গলায় বলে, কী জন্যে ডাকছেন?

এমনি ডাকাছি মা। এমনি। গল্প করি।

কী গল্প করবেন?

সুখ-দুঃখের গল্প।

গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না। চা খেতে চাইলে বলুন চা এনে দিচ্ছি।

আচ্ছা দাও, তাই দাও। চোখ দু'টা যাওয়ায় একেবারে অচল হয়ে পড়েছি। চিকিৎসাও হচ্ছে না।

চিকিৎসা হচ্ছে না কেন?

কে করাবে চিকিৎসা?

কেন–আপনার ছেলে করাবে।

আমার ছেলে আমার চিকিৎসা করাবে?

আপনার ছেলে আপনার চিকিৎসা করাবে না তো বাইরের মানুষে চিকিৎসা করাবে? এই সংসারের মানুষ তুমি চিন না মা। এই সংসারের মানুষগুলি কেমন তোমাকে বলি...

জালালুদ্দিন বিমলানন্দ ভোগ করছেন। সংসারের মানুষ চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব খুব সহজ দায়িত্ব নয়। মনোযোগী শ্রোতার সঙ্গে দার্শনিক কথাবার্তা বলতে তার ভাল লাগে। এই মেয়েটার মনোযোগী শ্রোতা হবার সম্ভাবনা আছে।

সংসারে মানুষ থাকে তিন রকমের–অগ্নি-মানুষ, মাটি-মানুষ আর জল-মানুষ। অমানুষও থাকে তিন পদের... জালালুদিনের হঠাৎ সন্দেহ হল সামনে কেউ নেই। মানুষ কয় প্রকার ও কী কী এই প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে মৃদু স্বরে ডাকলেন–মা কোথায় গো? মা কোথায়? মার জবাব পাওয়া গেল না। মা চা বানাতে গেছে। শ্বশুরের দার্শনিক কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই।

বাবা চা নিন।

জালালুদ্দিন গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিলেন। চায়ে চুমুক দিলেন–চমৎকার চা, কিন্তু তার গভীর মুখভঙ্গির বদল হল না। এ্যানাকে তিনি বুঝতে পারছেন না। কাউকে বুঝতে না পারলে অস্বস্তি লেগে থাকে। কে জানে এই মেয়েটা ঘর ভাঙনি মেয়ে কি-না। ঘর যদি ভেঙে দেয় তাহলে তিনি যাবেন কোথায়? তাঁর এই বয়সে, শরীরের এই অবস্থায় একটি শক্ত আশ্রয় প্রয়োজন। চা তার বিস্বাদ মনে হল।

হীরুর ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের প্রথম চা খাওয়াবে পীর সাহেবকে। তাকে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে আসবে। এতে দোকানের একটা পারলিসিটিও হবে। এত বড় পীর এসে চা খেয়ে গিয়েছে কম কথা না। পীর সাহেব আসতে রাজি হলেন না। তবে চায়ের বিশাল কেতলিতে ফুঁ দিয়ে দিলেন। বললেন, এতেই কাজ হবে। হীরু বিশেষ ভরসা পেল না।

জুন মাসের তিন তারিখ ভোর ছ'টায় তার চায়ের দোকান চালু হল। চা, পরোটা, সবজি ভাজি এবং ডাল এই তিন আইটেম। পরোটা, ভাজি এবং ডালের জন্য একজন কারিগর রাখা হল। কারিগরের নাম–মজনু মিয়া। কারিগরের দেশ ফরিদপুর। বয়স পঞ্চাশ। ছোটখাটো মানুষ, কথা বলে ফিসফিস করে এবং সেই সব কথার বেশির ভাগই বোঝা যায় না। কারিগরের বা হাতটা আচল। সেই অচল হাত শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে আছে। শরীরের অনাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে হাতটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলতে থাকে। একটি সচল হাত কারিগর মজনু মিয়ার জন্যে যথেষ্ট। এই হাতে অতি দ্রুতগতিতে সে পরোটা ভাজে। সেই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো দৃশ্য।

মজনু মিয়া নামকরা কারিগর। তাকে নিয়ে যে কটা রেস্টুরেন্ট শুরু হয়েছে সব ক'টা টিকে গেছে। রমরমা বিজনেস করছে। মজনু মিয়ার নিয়ম হল–কোনো রেস্টুরেন্ট যখন টিকে যায় তখন সে সরে পড়ে। রেস্টুরেন্ট বড় হওয়া মানে নতুন নতুন কারিগরের নিযুক্তি। নতুনদের সঙ্গে তার বনে না। সে কাজ করতে চায় একা। কাজের সময় সে কারো দিকে তাকায় না, কথা বলে না, হ্যাঁ-ই পর্যন্ত না। কাজের সময় সে শুধু ভাবে। ভাবে নিজের একটা রেস্টটুরেন্ট হয়েছে। গমগম করছে রেস্টটুরেন্ট। কাস্টমার আসছে যাচ্ছে। পরোটা ভেজে সে কুল পাচ্ছে না। এই স্বপ্ন সে গত ত্রিশ বছরে ধরে দেখছে। আজ সেই স্বপ্নকে

বাস্তব করার মতো ক্ষমতা তার আছে। ত্রিশ বছর সে কম টাকা জমায়নি। টাকা না জমিয়েই বা কী করবে? টাকা খরচের তার জায়গা কোথায়? আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। থাকার আলাদা ঘর। এই জীবনে করা হয়নি। যে রেস্টটুরেন্টে কাজ করেছে সেই রেস্টুরেন্টর বেঞ্চিতেই রাত কাটিয়েছে। নিজের একটি ঘরের প্রয়োজন সে ত্রিশ বছর। আগেও বোধ করেনি। আজো করে না।

রেস্টুরেন্ট চালুর দিনে হীরু অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করল। তার মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে ভো-ভো করে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। এই গরম হওয়া শরীরের ভেতরই তৈরি হচ্ছে কিন্তু বের হচ্ছে কোন পথে তা সে ধরতে পারছে না। বুকে হপিণ্ড বেশ শব্দ করেই লাফাচ্ছে। তার হাটের কোনো অসুখ আছে কী-না কে জানে। সম্ভবত আছে। আগে ধরা পড়েনি। এখন ধরা পড়ছে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন, প্রতিদিন দোকান খোলার আগে তিনবার সুরা ফাতেহা এবং তিনবার দরুদ শরীফ পড়তে। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে হীরুর কোনো দরুদ শরীফ মুখস্থ নেই। ভেবেছিল একটা নামাজ শিক্ষা এনে রাখবে। নামাজ শিক্ষায় সব দোয়া-দরুদ বাংলায় লেখা থাকে। দেখে দেখে তিনবার পড়ে ফেললেই হবে। কিন্তু নানান ঝামেলায় নামাজ শিক্ষা কেনা হয়নি। বিরাট খুঁত রয়ে গেল। হীরু খুবই বিষণ্ণ বোধ করল। তার বিষণ্ণভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রথম দিনেই রেস্টুরেন্ট জমে গেল। কারিগর মজনু মিয়ার ভাজি এবং পরোটা দুইই অতি চমৎকার হল। ভাজির রঙ লালাভ, একটু টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। শুধু খেতেই ইচ্ছা করে। মজনু মিয়া কিছু একটা দিয়েছে সেখানে–কী কে জানে। হীরুর মনে হল ভাজির রান্নার গোপন কৌশল শিখে রাখা দরকার। না শিখে রাখলে পরে সমস্যা হবে। মজনু মিয়া যদি দোকান ছেড়ে যায় তাহলে সে একেবারে পথে বসবে। তার রেস্টটুরেন্টে তখন কেউ থুথু ফেলতেও আসবে না।

টুকু অরুকে নিয়ে বের হয়েছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বলছে না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও অরু কোনো জবাব পায়নি। টুকু শুধু বলেছে চল না। যাই।

অরু সুতির একটা শাড়ি পরেছে। সাধারণ শাড়ি, কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে এই সাধারণ শাড়িটি তাকে খুব মানিয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে কিশোরী একটি মেয়ের মতো। যে মেয়ের চোখে পৃথিবী তার রহস্য ও আনন্দের জানালা একটি একটি করে খুলতে শুরু করেছে।

টুকু বলল, এইখানে একটু দাঁড়াও আপা। একতলা সাদা রঙের একটা দালানের সামনে অরু দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনের জায়গাটা ফুলের গাছে ভর্তি। নিকেলের চশমা পরা বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোক বাগানে কাজ করছেন। আরু বলল, এটা কার বাড়ি?

ওসমান সাহেবের বাড়ি।

এই বাড়িতে কী?

আছে একটা ব্যাপার। তুমি দাঁড়াও। আমি উনার সঙ্গে কথা বলে আসি।

ব্যাপারটা কী তুই আমাকে বলবি না?

একটা চাকরির ব্যাপার। তোমার একটা চাকরি হয়। কী-না দেখি।

তুই আমার চাকরি জোগাড় করে দিবি?

না, আমি দেব কিভাবে? বজলু ভাই চেষ্টা-চরিত্র করছেন।

বজলু ভাইটা কে?

তুমি চিনবে না, গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি। বজলু ভাইয়ের এখানে থাকার কথা। দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিয়ে আসি। বজলু ভাই এসে চলে গেলেন। কী-না কে জানে।

অরু দাঁড়িয়ে রইল। সুন্দর একটা বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার এক ধরনের লজ্জা আছে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার মানে এই সুন্দর বাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি তার নেই। সে বাইরের একজন। অরু দেখল। বুড়ো ভদ্রলোক নিজের মনে কাজ করছেন। টুকু হাত কচলে কচলে কী-সব বলছে। টুকুর ভঙ্গি বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গি। অভাব দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছে বোধ হয়। অরুর খুব লজ্জা লাগছে। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে তাকাচ্ছেনও না। কী হয় একবার তাকালে? একটা মানুষ নিশ্চয়ই বাগানের গাছগুলির চেয়েও তুচ্ছ না।

টুকু ফিরে এল। তার মুখ লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে। ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। কী কথা হয়েছে কে জানে। অরু বলল, চল যাই। টুকু বলল, আচ্ছা চল শুধু শুধু আসলাম।

অরু বলল, তোকে অপমান করেনি তো?

আরে না। অপমান করবে। কী। খুব যারা বড় মানুষ তারা কাউকে অপমান করে না। তারা খুব মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলে। অভাবী মানুষদের কথা শুনলে আবেগে আপুত হয়ে যায়। তখনি আমার রাগ লাগে। অসম্ভব রাগ লাগে।

তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তোর শরীরে রাগ আছে। তোর চেহারাটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

টুকু হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে বলল, তুমি কোনো রকম চিন্তা করবে না আপা, বজলু ভাই একটা ব্যবস্থা করবেই। খুব ছোটাছুটি করছে।

তোর বজলু ভাইয়ের হাতে বুঝি অনেক চাকরি?

না। বজলু ভাই আমাদের মতই গরিব মানুষ। তবে অন্য গরিবের জন্যে খুব ছোটাছুটি করতে পারে।

কেন ছোটাছুটি করে?

জানি না। ছোটাছুটি করতে বোধ হয়। ভাল লাগে।

একটা রিকশা নে টুকু, আর হাঁটতে পারছি না। আমার কাছে টাকা আছে।

টুকু রিকশা নিল; অরু বলল, ফেরার পথে হীরুর রেস্টুরেন্ট দেখে যাই চল।

টুকুর রেস্টুরেন্টে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। সে ক'দিন ধরেই হীরুকে এড়িয়ে চলছে। কারণ হীরু চায় টুকু ক্যাশে এসে বসুক। হীরু হচ্ছে দোকানের মালিক তাকে তো সারাক্ষণ ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে থাকলে চলে না। ক্যাশে বসবে টুকু। সে হবে ম্যানেজার। রেস্টুরেন্টর ম্যানেজার। খুব সহজ ব্যাপার তো না। এই বাজারে ম্যানেজারি পাওয়া আর বাঘের দুধ পাওয়া এক কথা। টুকু রাজি হয় না। তার ভাল লাগে পথে পথে ঘুরতে!

হীরু ক্যাশে বসে ছিল। টুকুদের নামতে দেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। এই প্রথম নিজের লোক রেস্টুরেন্ট দেখতে আসছে। এ্যানা বা তিথি এখনো আসেনি। বাসায় কারো মনে হচ্ছে কোনো আগ্রহ নেই। যাক তবু দু'জন এল।

অরু বলল, হীরু তোর কাজকর্ম দেখতে এলাম। বাহ সুন্দর তো। হীরুর মনটা ভাল হয়ে গেল। চারদিকে সবুজ কাগজ সেঁটে দোকানটাকে সে মন্দ সাজায়নি? টেবিলে ধবধবে সাদা ওয়াল ক্লথ। তিন দিকের দেয়ালে ক্যালেন্ডার থেকে সুন্দর সুন্দর ছবি কেটে বসানো হয়েছে। তার সীমিত সাধ্যে যতটুকু সম্ভব সে করেছে। হীরু বলল, গরিব মানুষের রেস্টুরেন্ট আপা। দেখার কিছু নেই। কেবিনে চলে যাও। কেবিনে বসে চা খাও। এই এক নম্বর কেবিনে দু'টা চা দে। কাপ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আনবি।

কেবিনও আছে না-কী?

থাকবে না! কী বল তুমি! মেয়েছেলের জন্যে দু'টা কেবিন। এক নম্বর কেবিন আর দুনম্বর কেবিন।

চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না?

পরোটা-ভাজি আর ডাল আছে। আগামী সপ্তাহ থেকে দুপুরে তেহারি হবে। ফুল প্লেট দশ, হাফ প্লেট ছ'টাকা। তেহারির সঙ্গে সালাদ ফ্রি।

অরু এবং টুকু চা খেল। কেবিন অরুর খুব পছন্দ হল। পর্দা টেনে দিলেই নিজদের ছোট্ট আলাদা একটা জগৎ। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল। তার যদি সত্যি কোনোদিন চাকরি-টাকরি হয় তাহলে সে প্রায়ই কোনো বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করে এই রেস্টটুরেন্টের কেবিনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে। সুখ-দুঃখের একান্ত কিছু গল্প।

অরুরা চলে যাবার সময় হীরু বলল, চায়ের দাম দিয়ে যাও আপা। ফ্রির কোনো কারবারই নেই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবার নগদ পয়সা দিতে হবে। রাগ কর বা না করি–এটা হল ব্যবসা।

অরু বলল, কত দিতে হবে রে? দু'টাকা। অরু, হাসিমুখে দু'টাকা বের করল।

হীরুর সময় এত ব্যস্ততায় কাটছে যে এ্যানার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করারও সময় পাচ্ছে না। অফিস-আদালত ছুটির দিনে বন্ধ থাকে। কিন্তু রেস্টুরেন্ট ছুটির দিনে সকাল সকাল খুলতে হয়, বন্ধ করতে হয় গভীর রাতে। অবশ্যি রাত যতই হোক এ্যানা তার জন্য অপেক্ষা করে। কড়কড়া ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয় না। হীরু বাসায় পা দেয়ামাত্র এ্যানা সব কিছু গরম করতে বসে। একজন তার জন্যে না খেয়ে অপেক্ষা করছে এটা ভাবতেও ভাল লাগে।

রাতে পাশাপাশি ঘুমুতে গিয়ে হীরুর প্রায়ই মনে হয় সবটাই বোধ হয় কল্পনা। তার মত একটা ছেলেকে এ্যানা বিয়ে করবে। কেন? এ্যানা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে বিয়ে করে মহাসুখে আছে। তার পাশে যে শুয়ে আছে সে ধরা-ছোঁয়ার কেউ না। কল্পনার একজন মানুষ। হীরু খুব দীর্ঘ একটা স্বপ্ন দেখে চলছে। এক'দিন স্বপ্ন কেটে যাবে। সে দেখবে তার পাশে কেউ

নেই। পকেটে দু'টা ডেম্প সিগারেট, একটা দেয়াশলাইয়ের ব্যাক্স এবং ন্যাতন্যাতে মযলা কয়েকটা নোট নিয়ে সে রাস্তায় হাঁটছে। ঘুমুতে যাবার আগে হীরুর খুব ইচ্ছা করে এ্যানার সঙ্গে আবেগ এবং ভালবাসার কিছু কথা বলতে। রেস্টটুরেন্টের কথা না, সংসারের কথা না, অন্য রকম কিছু কথা। যা বলতে হয় অস্বাভাবিক নরম গলায়। যা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে যায়, বুকের গভীরে সুখের মত কিছু ব্যথা বোধহয়। হীরু এসব কথা কখনো বলতে পারে না। বলতে গেলেই এ্যানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, চুপ কর তো। এই সব কথা কোথেকে শিখলে। ছিঃ! হীরু আহত হয়ে বলে–ছিঃর কী আছে?

ঘুমাও। সিনেমা সিনেমা কথা আমার অসহ্য লাগে।

হীরুর চোখে পানি আসার উপক্রম হয়। চোখের পানি আটকাতে তার খুব বেগ পেতে হয়। এ্যান্য এই ফাকে সংসারের কথা নিয়ে আসে। এইসব কথা শুনতে হীরুর একেবারে ভাল লাগে না। তবু সে মন দিয়ে শোনে। এ্যানার সঙ্গে কথা বলারও আলাদা আনন্দ আছে। এই মেয়েটি একান্তই তার অন্য কারোর নয়। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে তারা দু'জন কথা বলছে এও তো এক পরম বিস্ময়। তার মতো কজন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়? হীরু ভয়ে ভয়ে এ্যানার গায়ে হাত রাখে। সারাক্ষণই তার মনে হয় এই বুঝি এ্যানা তার হাত সরিয়ে দিল। এ্যানা হাত সরায় না। এও কী কম আনন্দের ব্যাপার? এ্যানা ঘুম ঘুম গলায় বলে, তিথি আপা সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বল তো?

জানি না।

কারো সঙ্গে কথাও বলে না। চুপচাপ থাকে।

একেক জনের একেক স্বভাব।

তিথি আপাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা শুনি–এসব কী সত্যি?

না।

টুকু যে কিছু করে না, পড়াশোনা না কিছু না রাতদিন ঘোবাফিরা। তোমরা কিছু বল না কেন?

বললে শুনে না।

বলে দেখেছ কখনো?

হীরুর ঘুম পায়। সে কোনো উত্তর দেয় না। এ্যানা শান্তভঙ্গিতে বলে, তুমি হচ্ছে সংসারের বড়। তোমাকেই তো সব দেখতে হবে।

দেখাদেখি করে কিছু হয় না। সব ভাগ্য।

আমার কলেজে ভর্তির ব্যাপারেও তো তুমি কিছু বলছ না।

হীরুর ঘুম কেটে যায়। সে শংকিতে গলায় বলে, তুমি কলেজে পড়বে না-কী?

পড়ব না–পড়ব না কেন?

মেয়েছেলের পড়াশোনার কোনো দরকার নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট আর পয়সা নষ্ট।

এইসব বাজে কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

শেখানোর কী আছে? সবাই তো জানে।

আজেবাজে কথা আর আমার সামনে বলবে না।

আচ্ছা।

গা থেকে হাত সরাও। হাত সরিয়ে ঘুমাও।

একবার ঘুম কেটে গেলে হীরুর আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। সে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। এ বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত আরো অনেকেই জাগে। জাগেন মিনু, প্রায় রাতেই তাঁর এক ফোঁটা ঘুম আসে না। জাগে তিথি ও অরু। দু'জন এক খাটে ঘুময়। দু'জনই জানে অন্যজন জেগে। আছে তবু একজন অন্যজনকে তা জানায় না। শুধু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান জালালুদ্দিন। আজকাল রাতে তার ভাল ঘুম হয়। এক ঘুমে রাত শেষ করে দেন। ঘুমের মধ্যে নানান রকম স্বপ্ন দেখেন। চোখে দেখতে পান না বলেই বোধ হয় রাতের স্বপ্নগুলির জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করে থাকেন। তার কাছে স্বপ্নের মানুষগুলিকে বাস্তবের মানুষদের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়।

১৯. অরুর চাকরি হয়ে গেল

জুন মাসের মাঝামাঝি অরুর চাকরি হয়ে গেল। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পোস্টিং। একটি বিদেশী এনজিওর আস্থায়ী চাকরি। চাকরির মেয়াদ তিন থেকে চার মাস। একুশ'শ টাকা বেতন। খাওয়াথাকা ফ্রি। হালুয়াঘাটে গারো ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল করা হয়েছে। সেই স্কুলে টিচার। অংক, বাংলা, ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ সেলাই এসব শেখাতে হবে।

টুকু বলল, আপা আজ দিনের মধ্যে ওদের জানাতে হবে তুমি যাবে কী যাবে না। যদি যাও তাহলে আজই ঢাকার হেড অফিসে জয়েন করবে। আজ থেকেই তোমার বেতন শুরু হবে। তুমি যাবে?

বুঝতে পারছি না।

টুকু বিরক্ত হয়ে বলল, সবই তো বুঝিয়ে বললাম, আর কী বুঝতে পারছি না?

চাকরি করতে পারব কী পারব না।–এইটাই বুঝছি না। আমাকে দিয়ে কী এইসব হবে?

অন্য মেয়েরা কিভাবে করে?

আমি কী অন্য মেয়েদের মত?

কেন, তুমি আলাদা কীভাবে?

তুই বুঝতে পারছিস না। বাসা থেকে ওরা ছাড়বে কেন? এত দূরে চাকরি, ঢাকায় হলেও একটা কথা ছিল।

তুমি তাহলে চাকরি নেবে না?

নেব না তো বলিনি, ভাবছি।

যা ভাবাভাবির ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ভেবে নাও। বাসার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বাসার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক।

টেম্পোরারি চাকরি। চার মাস পর ছাড়িয়ে দেবে।

চার মাসের অভিজ্ঞতা হল না, এই অভিজ্ঞতা তখন কাজে লাগবে। এটা দেখিয়ে অন্য চাকরি জোগাড় করব।

কাউকে কিছু বলব না?

না।

তুই বলছিস সত্যি সত্যি আমার চাকরি হয়ে গেছে? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

তুমি মনস্থির কর আপা। কী করবে ভেবে ফেল। অনেক কষ্টে এই চাকরি পাওয়া গেছে।

চল যাই। চাকরি করব কী করব না যেতে যেতে ঠিক করব।

অরু ভেবেছিল বিরাট কোনো অফিস হবে। দেখা গেল সে রকম কিছু না। ধানমণ্ডিতে একতলার ছোট্ট বাড়ি। বসার ঘর বেতের সোফা দিয়ে সাজানো। বসার ঘরে শিশুদের হাসিমুখের বড় বড় কিছু পোস্টার। প্রতিটি পোস্টারের নিচে লেখা–এই শিশুটি যুদ্ধ চায় না। সে আনন্দে বাঁচতে চায়। বসার ঘরে আরো কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। টুকু অরুকে তাদের পাশে বসিয়ে রেখে চলে গেল। ভেতরে খবর দেয়া হয়েছে। যথাসময়ে ডাক পড়বে। যে ভদ্রলোক কথা বলবেন তার নাম ড. বরাট গোরিং। ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে এই সংস্থার প্রধান। অরু বলল, আমি তো ইংরেজি বলতে পারি না, উনার সঙ্গে কথা বলব কী করে?

উনি বাংলা জানেন। তোমার চেয়ে ভাল বাংলা বলেন।

অরু অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টাখানিক বসে থাকার পরও তার ডাক পড়ল না। অরুর ধারণা হল ভদ্রলোক হয়ত তার কথা ভুলেই গেছেন। তার কী উচিত চলে যাওয়া? না-কি তার উচিত যাবার আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেই যেচে গিয়ে কথা বলা?

মিস শাহানা বেগম কী আপনার নাম?

অরু, শূন্যদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। শাহানা বেগম তারই নাম। এই নামে কেউ কখনো ডাকে না। সবাই অরু ডাকে। এই বিদেশীর মুখে শাহানা নামটা কি রকম অচেনা লাগছে। আর এ রকম একজন বিদেশী এত সুন্দর করে বাংলা বলছে কিভাবে?

আপনার নাম কী মিস শাহানা?

জি।

আমি এতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি সেই কারণে আপনি কী আমার ওপর রাগ হয়েছেন?

জি-না। আমি রাগ করিনি। রাগ করব কেন?

আপনি কী আমার বাংলা বুঝতে পারছেন?

পারছি। আপনার খুব সুন্দর বাংলা।

আসুন আমার ঘরে আসুন।

অরু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল শুরুর অস্বস্তির কিছুই এখন আর তার নেই। গাঢ় নীল রঙের চকচকে হাওয়াই শার্ট পরা এই বিদেশীকে তার ভাল লাগছে। দূরের কেউ বলে মনে হচ্ছে না। এ রকম মনে হবার কারণ কী? সে চমৎকার বাংলা বলছে–এটাই কি একমাত্র কারণ? ন-কী তার গলার স্বরের আন্তরিক ভাব অরুকে আকৃষ্ট করেছে? না-কি ভদ্রলোকের মাথাভর্তি সোনালি চুল? চুলগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

মিস শাহানা।

জি।

আপনার তাহলে এই ধারণা হয়েছে যে আমি ভাল বাংলা বলি?

জি।

আপনার ধারণা যথাযথ নয়। প্রায়ই আমি ক্রিয়াপদগুলি এলোমেলো করে ফেলি। তাছাড়া আপনাদের বাংলা ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি এখনো বুঝতে পারি না। আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়।

কী বৈশিষ্ট্য?

যেমন ধরুন দেখা শব্দটির মানে হচ্ছে To see, চোখ দিয়ে দেখা। অথচ আপনার নানানভাবে শব্দটি ব্যবহার করেন–গানটা শুনে দেখি। মিষ্টিটা খেয়ে দেখি। একটু বসে দেখি। গান শোনা, মিষ্টি খাওয়া বা বসার সঙ্গে চোখের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা দেখা শব্দটা ব্যবহার করছেন।

অরু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এভাবে সে কখনো ভাবেনি। সত্যি তো মজার ব্যাপার!

তারপর মিস শাহানা বেগম, বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা এখন স্থগিত। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি–চাকরিটি কী আপনার পছন্দ হয়েছে?

জি, হয়েছে।

পছন্দ হবার মত তেমন কিছু নয়। তবু খারাপ লাগবে না, জায়গাটা খুব সুন্দর। তাছাড়া যাদের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন তাদের আপনার ভাল লাগবে। আপনি কাজ করবেন শিশুদের নিয়ে। শিশুদের মত সুন্দর আর কিছু তো হয় না। তাই না?

জি অবশ্যই।

এখন বাজছে একটা পাঁচ। চা খবর সময় নয়। তবু যদি আপনি আমার সঙ্গে চা খান আমি খুশি হব। লাঞ্চ করতে বলতে পারছি না। কারণ আমার লাঞ্চের একটি অ্যাপায়েন্টমেন্ট আছে।

অরু, চা খেল। পটে করে চা নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক অরুকে লজ্জায় ফেলে নিজেই চা বানিয়ে এগিয়ে দিলেন। এটা হয়ত ওদের সাধারণ ভদ্রতা। অথচ কী সুন্দর এই ভদ্রতা।

আমি আপনার অতীত ইতিহাস সবই শুনেছি। আমরা আমাদের কাজের জন্যে আপনার মত মেয়েদের খুঁজে বের করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, আপনার মত মহিলারা সুযোগ পেলেই তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা দেখানোর চেষ্টা করেন, প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তারা তুচ্ছ নন।

ভদ্রলোক গাড়ি করে অরুকে বাসায় পাঠালেন। গাড়িতে উঠবার সময়ও একটা কাণ্ড হল, তিনি নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে হালুয়াঘাট যেতে পারেন। আমি আগামী সপ্তাহে বাই রোডে যাব। আর বাই রোডে যেতে না চাইলে ট্রেনে করে চলে যাবেন। আপনার থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য আমি মেসেজ পাঠিয়ে দেব। অরু বলল, আমি আপনার সঙ্গেই যাব। বলেই তার মনে হল যে

অন্যায় কোনো কথা বলছে। এরকম কথা তার বলা উচিত হয়নি। ভদ্রলোক কিছু মনে করলেন কি-না কে জানে। কিছু মনে করলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

অরু ভেবেছিল তার ঢাকার বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার খবরে খুব হৈচৈ হবে। দেখা গেল কোনো রকম হৈচৈ হল না। মিনু বললেন, যা ইচ্ছা কর। আমি কাউকেই কিছু বলব না। জালালুদ্দিন বললেন, অধ্যাপনা অতি উত্তম ধর্ম। পৃথিবীর সবচে বড় দান হচ্ছে বিদ্যা দান। তাছাড়া বেতন ভাল। মনে হচ্ছে খ্রিস্টান করে ফেলবে। ঐ দিকে নজর রাখবি। এই বংশের কেউ খ্রিস্টান হয়ে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না। শুধু তিথি আপত্তি করল। নরম গলায় বলল, এদের সম্পর্কে নানান রকম গুজব আছে আপা। মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে। ওদের সম্পর্কটা অনেক খোলামেলা, ওরা এটাকে বড় কিছুও মনে করে না।

তুই কী বলছিস আমি যাব না?

তা বলছি না। এখানে থেকেই বা তুমি কী করবে। শুধু বলছি যে, সাবধানে থাকবে।

নিতান্ত কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটল অরুর হলুয়াঘাট রওনা হবার ঠিক আগের দিন– একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসে উপস্থিত। প্রাপক শাহানা বেগম। প্রেরক আব্দুল মতিন। খাম খুলে দেখা গেল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। ধুপচাঁচা গ্রামের মৌলানা আবু বকর সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মত নূরুর নাহার বেগম (লাইলীর) সহিত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের জনাব আব্দুল কুদ্দুস। সাহেবের প্রথম পুত্র আব্দুল মতিনের শুভ বিবাহ। বিবাহ অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। অরুকে আহত করবার জন্যেই চিঠি পাঠানো। তবে অরু, আহত হল কি-না বোঝা গেল না। তার চেহারায় মনের অবস্থার কোনো ছাপ পড়ল না।

অরু, হালুয়াঘাট পৌঁছে কোনো খবর দিল না। তিথি পরপর দু'টি চিঠি লিখল–সেই চিঠিরও জবাব এল না। এক মাসের মাথায় টুকু চিন্তিত হয়ে ধানমণ্ডির বাসায় খোঁজ নিতে গেল। ড. গোরিং অফিসেই ছিলেন। তিনি সব শুনে চিন্তিত মুখে বললেন চিঠির জবাব দিচ্ছেন না কেন তা তো বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে গত সপ্তাহেই দেখা হয়েছে। সে বেশ ভাল আছে–এইটুকু বলতে পারি।

চিঠি কী হাতে পৌঁছোচ্ছে না?

না পৌঁছানোর কোনো কারণ নেই। তাছাড়া তোমাদের চিঠি না পেলেও তো সে তার খোঁজ দেবে। দেবে না?

আমার কী মনে হয় জানো–সে নিজেকে আড়াল করে ফেলতে চেষ্টা করছে। পরিচিত জগৎ থেকে লুকিয়ে পড়তে চাইছে। তোমাদের বাংলাদেশী মেয়েরা সামাজিক অমর্যাদার ব্যাপারে খুব সেনসেটিভ। তুমি বরং প্রিপেড টেলিগ্রাম করে দাও। তারপরে যদি জবাব না। আসে নিজেই চলে যাও। হালুয়াঘাট এমন কিছু দূরের জায়গা নয়।

প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব এল। অরু জানিয়েছে–সে ভাল আছে। তার কিছুদিন পর টুকুর কাছে দুই লাইনের চিঠি এল।

টুকু,
আমি ভাল আছি। কাজ শুরু করেছি। আমাকে নিয়ে শুধু শুধু কেউ যেন দুশ্চিন্তা না করে।

ইতি— অরু আপা।

অরুর সঙ্গে তার পরিবারের এই হচ্ছে শেষ যোগাযোগ। এই পরিবারের সদস্যরা অরুর আর কোনো খোঁজ পায়নি। টুকু এবং গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি বজলুর রহমান খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করল। তেমন কিছু জানা গেল না। এই এনজিও কাজকর্ম গুটিয়ে স্বদেশে চলে গেছে। এখানকার কেউ তেমন কিছু বলতে পারে না। ড. গোরিং একজন বাঙালি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন–এইটুকু জানা গেল। তবে সেই একজন অরু কী-না তা কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারল না। নিউইয়র্ক এনজিওর হেড অফিসে যোগাযোগ করেও কিছু জানা গেল না। হেড অফিস জানাল ড. গোরিং এখন আর তাদের সঙ্গে কর্মরত নয়। কাজেই তারা তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না।

শুধু হীরুর পীর সাহেব হীরুর কান্নাকাটিতে গলে গিয়ে জ্বীনের মারফত খবর এনে দিলেন–অরু ভালই আছে। তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। মাতা ও কন্যা সুখেই আছে। পীর সাহেবের কোনো কথাই হীরু অবিশ্বাস করে না। এইটা করল। ক্ষীণ স্বরে বলল, কী বললেন স্যার? কন্যাসন্তান হয়েছে?

হ্যাঁ বাবা হয়েছে। জ্বীনের মারফত খবর পেয়েছি।

জ্বীন কোনো ভুল করেনি তো? মানে মিসটেক। মানুষ যেমন ভুল করতে পারে জ্বীনও নিশ্চয়ই পারে।

তুমি এখন যাও হীরু।

অন্য একটা জ্বীনকে দিয়ে যদি স্যার একটু ট্রাই করেন মানে আমরা খুব কষ্টে আছি।

তুমি বিদেয় হও তো। হীরু মুখ কালো করে চলে এল। এই প্রথম পীরের আস্তানা থেকে বের হয়ে সে মনে মনে বলল—শালা ফটকাবাজ।

২০. তিথি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে

তিথি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে। হাঁটতে তার ভাল লাগছে। আকাশ ঘন নীল। ঝলমল করছে। রোদে শিশুদের গায়ের ওম। এমন সময় হাঁটিতে ভাল লাগারই কথা। তিথির কোনো গন্তব্য নেই। একটা ফুলওয়ালীর কাছ থেকে সে ফুল কিনল। একজন ভদ্রলোক তার কাছে জানতে চাইলেন, দিলু রোড কোন দিকে? সে ভদ্রলোককে খুব ভাল করে দিলু রোডে যাবার পথ বলে দিল। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞচোখে চলে যাচ্ছেন। সে হাঁটছে। বড় ভাল লাগছে হাঁটতে।

একেকটা দিন এ রকম হয়। হাঁটতে ভাল লাগে। বিশেষ করে যখন গন্তব্য বলে কিছু থাকে না। যাবার কোনো বিশেষ জায়গা না থাকার মানেই হচ্ছে সব জায়গায় যাওয়া যায়।

তিথি বিকেলের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত হবার পরই নাসিমুদ্দিনকে দেখতে গেল। সে অনেক'দিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছে। তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। বিশেষ কোথাও যেতে তিথির ইচ্ছা করে না। নাসিমুদ্দিন যদি রাস্তায় থাকত বেশ হত। অনেকবার দেখা হত।

নাসিম বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় পড়ে আছে। তিথিকে দেখে উজ্জ্বল চোখে তাকাল, এস তিথি এস। একমাত্র তুমিই আসি। আর কেউ আসে না। আমার স্ত্রীও আসে না।

আপনি কেমন আছেন?

ভাল না। পায়ে কী যেন হয়েছে, কেউ কিছু বলে ও না। পা না-কি কেটে বাদ দিতে হবে। পাপে ধরেছে, বুঝলে তিথি পাপ। এই জীবনটা মহাপাপ করতে করতে কাটালাম।

খুব ব্যথা হয়?

আমার কথা বাদ দাও। তুমি কেমন আছ?

ভাল আছি।

তোমার ভাইয়ের ব্যবসা না-কি ভাল হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তোমাকে সহ্য করে তো। একবার টাকা-পয়সার মুখ দেখলে পুরোনো কথা কেউ মনে রাখে। না। তোমার ভাই কী তোমাকে হাতখরচ দেয়?

দেয়।

ভাল। খুব ভাল। শুনে খুশি হলাম। তোমার মুখ এমন শুকনো লাগছে কেন তিথি? কিছু খাবে? একটা কলা খাও। এরা হাসপাতাল থেকে কলা ডিম এইসব দেয়, খেতে পারি না। তুমি কলাটা খাও।

তিথি বিনা বাক্যব্যয়ে কলা খেল। তার ক্ষিধে পেয়েছে। আসলেই সারাদিন কোনো খাওয়া হয়নি।

তিথি।

জি।

তোমার যে একটা বোন কোথায় চলে গিয়েছিল তাকে কী পাওয়া গেছে?

জি না।

ঢাকা শহর হল অদ্ভুত শহর। এই শহর হঠাৎ মানুষ গিলে খেয়ে ফেলে। আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

আমি উঠি?

না-না বস। আর একটু বস। কেউ আসে না। তুমি মাঝে-মধ্যে আস ভাল লাগে। পাপের শাস্তি হচ্ছে। মহাপাপ করেছিলাম।

আপনি কোনো পাপ করেননি। আপনি না থাকলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ।

এইটা ভুল কথা বললে তিথি। খুব ভুল কথা। আমাদের কারোর কাছে কারার কোনো ঋণ নাই।

যাই এখন?

বস। আরেকটু বস।

তিথি বসে। তার তো যাবারো তেমন জায়গা নেই। বসে থাকতেই বা অসুবিধা কী? রাত বাড়ে ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষটার মাথার কাছে তিথি বসে থাকে। এক সময় নাসিম বলে এখন চলে যাও। রাত হচ্ছে। তিথি বলে–আরেকটু বসি। কোনো অসুবিধা নেই।

জালালুদিনের চোখের অপারেশন হল প্রাইভেট ক্লিনিকে। হীরু দরাজ গলায় বলল, ফাদার-মাদারের জন্য টাকা খরচ করব না তো কোন শালার জন্যে করব? টাকা-পয়সা হচ্ছে আমার কাছে তেজপাতা। অপারেশনের পর ডাক্তার চোখে হলুদ আলো ফেলে বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, কাঁটা আঙুল বলুন তো?

পরিষ্কার বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে তিনটা।

তার মানে কিছু দেখছেন না।

কে বলল দেখছি না? পরিষ্কার দেখছি। আপনার আঙুল হচ্ছে দু'টা ঠিক না?

ডাক্তারের মুখ বিমর্ষ হয়ে যায়। কিন্তু জালালুদ্দিন বড়ই আনন্দ বোধ করেন। এতগুলি টাকা শুধু তার জন্যই খরচ হচ্ছে–এটা কী কম কথা? দরকার হলে আরো খরচ হবে। হীরু তো বলেছে।–টাকা-পয়সা তার কাছে তেজপাতা। এ হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান। শুরুতে বুঝতে

পারেননি। শুরুতে আসলে কিছুই বোঝা যায় না। মর্নিং শোজ দা ডে। কথাটাই ভুল। দেখা যায় সকালে ঝলমলে আলো, দুপুর হলেই চারদিক অন্ধকার করে ঝড়।

এসব কথা সব বদলে ফেলা দরকার; কোমলমতি শিশুদের ভুল কথা শেখানো হচ্ছে। উচিত না। কাজটা খুবই অনুচিত হচ্ছে।

ও বাবা হীরু।

জি।

চোখটা তো মনে হয় সেরেই গেল। ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলি পরিষ্কার দেখলাম। গুণতে পারলাম না। দেখা এক জিনিস আর গোণা এক জিনিস। ঠিক কী-না। বাবা বল।

তা তো ঠিকই। এখন চল বাড়ি যাই।

আরো কয়েকটা দিন থাকি। এদের আদর-যত্ন অসাধারণ। একটা নার্স আছে নাম রুচিতা। ভাবছি। এই মেয়েটাকে ধর্ম মেয়ে বানিয়ে ফেলব। অসাধারণ একটা মেয়ে।

পহেলা শ্রাবণ হীরু নতুন বাড়িতে উঠল। সেই উপলক্ষে কাঙালি ভোজ হল। মিলাদ হল। বাড়ি বিশাল কিছু না, তবে ভবিষ্যতে বড় হবে। তিনতলা ফাউন্ডেশন। নতুন বাড়িতে ঢুকে আনন্দে ঘুমুতে পারেন না জালালুদ্দিন। ঘন ঘন এ্যানাকে ডাকেন।

ও বৌমা বৌমা।

এ্যানার হাতে শতেক কাজ তবু সব বিরুক্তি মুছে পাশে দাঁড়ায়। জালালুদ্দিন ধরা গলায় বললেন, সব তোমার জন্যে হচ্ছে গো মা–সবই তোমার জন্য। তোমার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখি তো মা।

সাজিয়ে রাখলে কী হবে? আপনি তো আর দেখতে পারবেন না?

আমি না পারলাম। অন্যে দেখবে। যেই আসবে তাকেই বলব, এই দেখ গো সবই আমার বৌমার ভাগ্যে হল। এই হচ্ছে আমার বৌমা।

আপনি বড় বেশি কথা বলেন। কথা কম বলবেন। চা খেতে চাইলে বলেন চা এনে দিচ্ছি।

একটু কফি দাও। কফির কাছে চা দাঁড়ায় না গো মা। কফির মজাই অন্য।

এ্যানা কফি আনতে যায়। আপনমনে কথা বলেন জালালুদ্দিন। নিজের মনে কথা বলতে তার বড় ভাল লাগে। জীবনটা বড়ই মধুর মনে হয়। বড়ই সুখের বলে বোধ হয়। গুনগুন করে আজকাল গানও গান–ওগো দয়াময়। বড় দয়া তোমার মনে ওগা। দয়াময়–সবই তার স্বরচিত গান। তিনি যে একজন স্বভাবকবি এই তথ্য আগে জানা ছিল না। হীরুর বেশ কিছু কর্মচারীও এই বাড়িতে থাকে। তাদের সাথেও তার বড় মধুর সম্পর্ক। জীবন কী? জীবনের অর্থ কী? এসব গূঢ় কথা তিনি তাদের বলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে বলেন–

ভাগ্য–সবই ভাগ্য। এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল রাখবা। আজ যে রাজা কাল সে পথের ফকির। এর কারণ কী? এর কারণ ভাগ্য। এখন ভাগ্য কী...

তিনি সবাইকে ভাগ্য কী তা ব্যাখ্যা করেন। সবাই মন দিয়ে শোনে না। আশ্চর্যের ব্যাপার মন দিয়ে শুনে টুকু। টুকু কেন এত আগ্রহ নিয়ে বাবার কথা শোনে তা জালালুদ্দিনও ঠিক বুঝতে পারেন না।

টুকুর ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব আরো বেড়েছে। মাঝে মাঝে মাসের পর মাস তার কোনো রকম খোঁজ পাওয়া যায় না। তারপর হঠাৎ এক'দিন মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ নিয়ে উদয় হয়। হীরু ভীষণ বিরক্ত হয়, আমার আপনা ভাই ঘরে আর আমার কি-না তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে ম্যানেজার রাখতে হয়। আফসোস। বড়ই আফসোস। এখন আমার দরকার নিজের লোক।

হীরুর নিজের লোকের অভাবে সত্যি সত্যি অসুবিধা হয়। অনেক টাকার লেন-দেন। সব একা সামলাতে হয়। মাথার ঠিক থাকে না। টুকু লেখালেখির চেষ্টা করে। তার খুব ইচ্ছা করে নিজেদের জীবনের কথাটাই সুন্দর করে লিখে ফেলতে। দুঃখ, বেদনা ও গ্লানির মহান সংগীতকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। পারে না। তবে মনে হয় পারবে। এক'দিন না এক'দিন জনম জনমের গল্প বের হয়ে আসবে।

হীরু নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রিকন্ডিসান্ড টয়োটা সন্টারলেট একটা কিনেছে। সেই গাড়িতে রোজ জালালুদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ হাওয়া খান। রোজ খানিকটা ফ্রেশ অক্সিজেন না নিলে তার নাকি রাতে ভাল ঘুম হয় না।

এই পরিবারের একজন মাত্র মানুষ রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারেন না। তিনি মিনু। চোখ মেলে তিনি সারারাত তিথির পাশে শুয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে একটা হাত রাখেন। তিথির গায়ে। তিথি সেই হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে–গায়ে হাত দিও না মা।

এত আদর করে গায়ে হাত রাখি তুই এমন করিস কেন মা?

তিথি কঠিন গলায় বলে, গায়ে হাত দিলেই মনে হয় পুরুষ মানুষের হাত। কেমন গা ঘিনঘিন করে।

মা-রে তুই শুধু আমাকে শাস্তি দিচ্ছিস কেন?

আমি কাউকে শাস্তি দিচ্ছি না মা।

এত সখা করে হীরু গাড়ি কিনেছে একবার চড়ে দেখবি না?

চড়ব। কালই চড়ব। এখন ঘুমাও। মিনু ঘুমুতে চান। ঘুমুতে পারেন না। রাত বাড়ে।

২১. বিশাল আকাশ

এক সন্ধ্যায় মনজুর সাহেব হীরুদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রমরমা দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তিনি মেয়ে বিয়ে দিচ্ছেন। সেই বিয়ের দাওয়াতের কার্ড নিয়ে এসেছেন। চারদিকের কায়দাকানুন দেখে হকচাকিয়ে গেছেন। তিথি বের হয়ে বলল, কেমন আছেন চাচা? তিনি হকচাকিয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন, ভাল আছি। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ মা? তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলে, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন? ঐ যে অভাবের সময় টাকার জন্যে যেতাম। আপনি এত আদর করতেন। মনে আছে। মনজুর সাহেব কিছু বলেন না। মুখ শক্ত করে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বুঝি?

হুঁ।

বড় মেয়ে না ছোট মেয়ে?

ছোট মেয়ে। যেও কিন্তু।

যাব। অবশ্যই যাব। আপনার কাছ থেকে আদর খেয়ে আসব। আপনার আদরের কথা সব সময় আমার মনে হয়।

উঠি তিথি।

না, না। আপনি কেন উঠবেন। আমি আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াব। আপনার মনে আছে চাচা আপনি এক'দিন হালুয়া বানিয়ে চামুচে করে আমাকে খাইয়েছেন। মনে আছে, না মনে নেই?

মনজুর সাহেব বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। তার অস্বস্তি দেখে গভীর করুণায় তিথির মন হঠাৎ কেমন যেন ভরে যায়। হঠাৎ মনে হয় কী দোষ এই লোকটার? কোনো দোষই তো নেই।

অরুর চিঠি এসেছে। সে চিঠি লিখেছে নিউ জার্সি থেকে। সে ভাল আছে। সুখে আছে। স্বামীর সঙ্গে আছে। এই হচ্ছে চিঠির বক্তব্য। স্বামী কে? সে কোথায় আছে সেই সব কিছুই নেই। বড়ই সংক্ষিপ্ত চিঠি। শুধু চিঠির এক কোণায় লেখা তিথি, তোকে রোজ স্বপ্নে দেখি। তিথি তোর কী হয়েছে রে?

তিথির কী হয়েছে সে নিজেও জানে না। সে শুধু জানে যে তার হাঁটতে ভাল লাগে। মতিঝিল থেকে টিপু সুলতান রোড, সেখান থেকে গেণ্ডরিয়া। গেণ্ডারিয়া থেকে সূত্রপুর। এত ভাল লাগে কেন হাঁটতে? শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ মেঘে মেঘে আকাশ যখন কালো হয়ে যায়, যখন চক্রাকারে আকাশে সোনালি ডানার চিল উড়তে থাকে। তখন কেন জানি সব ছেড়েছুড়ে ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এমন কোনো ঘর যে ঘরে দুবাহু বাড়িয়ে কেউ-একজন অপেক্ষা করে আছে। যে ঘরে পা দেয়া মাত্র বলবে মেঘলা দিনে কোথায় কোথায় ঘুরছিলে বল তো? তিথি হাসবে। সেই মানুষটা কোমল অথচ রাগী গলায় বলবে, হাসবে না তো। হাসির কোনো ব্যাপার না। দেখ না। কেমন ঝড় শুরু হল। এই দিনে কেউ বাইরে থাকে? তিথি বলবে, হোক ঝড়; এস না। আমরা খানিকক্ষণ ভিজি।

তুমি কী পাগল হলে তিথি?

হ্যাঁ পাগল হয়েছি। এস তো।

তিথি সেই মানুষটাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবে। লোকটি যতই রাগ করবে সে ততই মজা পাবে। কিন্তু তিথির জন্যে তেমন কেউ অপেক্ষা করে নেই, কোনোদিন করবেও না। তার জন্যে অপেক্ষা করবে বিশাল আকাশ। যে আকাশ সবার জন্যেই অপেক্ষা কবে। আবার কারো জন্যেই করে না।